ভৌতিক অলৌকিক

অনন্য প্রকাশন ৬৬ কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

অলৌকিক? না লৌকিক? ১৬ গল্প

লেখকের অন্যান্য বই

রহস্যেঘেরা রাক্ষসখালি
অসি বাজে ঝনঝন
আরবি পুঁথির রহস্য
জগুমামার চাররহস্য
হেরে যাবেন জগুমামা?
আজও রোমাঞ্চকর
রহস্য রাতের পদ্মায়
সাক্ষী ছিলেন জগুমামা
নীল কাঁকড়ার রহস্য
রক্তরহস্য

লেখকের সম্পাদিত বই

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭১
শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭১
কিশোর ভারতী সেরা সমগ্র
কিশোর ভারতী উপন্যাসসমগ্র
জঙ্গল অমনিবাস
সেরা জোকস ৪০১
সেরা পঁচিশ হাসির গল্প
সেরা পঁচিশ গোয়েন্দা গল্প
সেরা পঁচিশ হাসির গল্প
অপরূপ রূপকথা
ভয়ের গল্প ৫১
হাসির গল্প ৫১

কালবৈশাখী

ওসি আছেন? ওসি?

—না। বড়বাবু রাউন্ডে বেরিয়েছেন।

—বেরিয়েছেন? কখন ফিরবেন বলুন তো?

—আধঘণ্টা তো বটেই। কে আপনি?...এত হাঁফাচ্ছেন কেন?

—বিপদ! ভয়ানক বিপদ! এমার্জেন্সি।

—বিপদ? দাঁড়ান, দাঁড়ান। কী হয়েছে? ছিনতাই, ডাকাতি—

—মার্ডার। উঃ, দশমিনিট চলে গেল! কী যে করি!

—ক্-কী! মার্ডার? কোথায়? কতদূরে? একমিনিট। আমি এখনই ফোর্স অ্যারেঞ্জ করছি।...স্বপন, অ্যাই স্বপন!

—উহুঁ, প্লিজ। বলছি তো, ওসব কিচ্ছু করতে হবে না। আমি নিজে, আমি...

—'আমি কী'? কী ব্যাপার বলুন তো মশাই? এসে থেকে আপনি ছটফট করছেন। আমি এই থানার অ্যাডিশন্যাল ওসি। যা বলার আমায় বলুন।

—বলছি, বলছি, সব বলব। বলতেই হবে। প্লিজ, তাড়াতাড়ি একটা টেপ দিন। রেকর্ড করব।

—আপনার স্টেটমেন্ট! আপনি কি মার্ডারের আই-উইটনেস? সে পরে নিলেও চলবে মশাই। আগে চলুন তো, ঘটনার জায়গাটায় যাই। ওটাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি।

—উঃ—না! লাশ কোথাও পালিয়ে যাবে না। কিন্তু দেরি করলে আমি, আমিও লাশ হয়ে যাব। সবচেয়ে আগে আমার কথা, বলতে পারেন আমার স্বীকারোক্তি আমায় রেকর্ড করাতেই হবে। একদম সময় নেই।

—স্বীকারোক্তি?

—হ্যাঁ। খুনটা যে আমিই করেছি। আধঘণ্টা আগে। প্লিজ। তাড়াতাড়ি।...

আমার নাম বীরেশ ভট্টাচার্য। বাবা-মার দেওয়া ওই নামটা বাইরের দুনিয়া জানে। স্কুল-কলেজ, রেশন বা আই-কার্ড সবখানে এই নামটাই জ্বলজ্বল করছে। অন্য এলাকায় আবার আমার এ নাম অজানা। বিবি, সার্ক, প্ল্যাস্টিক, কিল এরকম আট-দশটা নামে আমায় তারা চেনে।

আমি একজন প্রফেশন্যাল কিলার। সাদা বাংলায় পেশাদার খুনি। পেশা এবং নেশাও বলতে পারেন। মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি।

তবে হেজিপেজি লোক মেরে আমি হাত গন্ধ করি না। সোসাইটির একেবারে ক্রিম, আমার শিকার যাকে বলে উপরতলার মানুষ। আমার রেটটা তাই একটু বেশি। পাঁচ পেটি থেকে শুরু। পাঁচ পেটি বুঝলেন তো, পাঁচ লাখ।

বছরে খুব বেশি হলে তিনটে থেকে চারটে। এর বেশি কাজ আমি নিই না। বাকি সময়টা, আমার ড্রেস মেটিরিয়ালের একটা মাঝারি শো-রুম আছে। সেটা দেখাশোনা করি। আর পাঁচজন স্বচ্ছল মানুষের মতো

দিন কাটাই। ছেলেমেয়ে-বউ নিয়ে সুখী সংসার।

এখনও পর্যন্ত মোট বত্রিশটা শিকার আমি করেছি। না, ঠিক বলিনি। আজকেরটা ধরলে তেত্রিশ। উঃ, আজকেরটা কেন যে...

হ্যাঁ, বলছি। একগ্লাস জল দিন প্লিজ। গলা কাঠ হয়ে গেছে।...আঃ।

হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত কোনও পুলিশ-গোয়েন্দা আমার টিকি ছুঁতে পারেনি। গত সাত বছরে পুলিশের খাতায় সবকটাই রহস্যজনক মৃত্যু। ফাইল বন্ধ হয়ে গেছে, কিংবা উলটোপালটা লোক ধরা পড়ে, জেল খাটছে।

পুলিশ-আমলাদের দু-তিনজন হোমরা-চোমরা আমার স্কুল-কলেজের বন্ধু। এখনও রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা। নিজেদের আড্ডায় যখন এসব খুনের প্রসঙ্গ ওঠে, ওদের চোয়াল ঝুলে যায়। আমি ভিতরে-ভিতরে খুব হাসি। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, আমার মতন সুদর্শন ভদ্র-সভ্য-নিরীহ ছেলে খুন তো দূরের কথা, কারও সঙ্গে কখনও ঝগড়াও করতে পারে।

আমার আগের বত্রিশজন শিকার প্রত্যেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, ডাক্তার, রাজনৈতিক নেতা। কারা আমায় দিয়ে ওদের খুন করিয়েছে, আমি জানি না। জানতে চাইও না। আমার সব অ্যাসাইনমেন্ট আসে গ্লোবাল এজেন্সির মাধ্যমে।

চেনাজানার দরকারই বা কী? কী দরকার খুনের মোটিভ জেনে? আমায় টাকা দেওয়া হয়। আমি মালটাকে খালাস করে দিই। তবে সেটা করার জন্যে ছক সাজানো, শিকার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করা সব আমাকেই করতে হয়। অবশ্য এজন্যে আমি কমপক্ষে পনেরো দিন সময় নিই।

আজকের কাজটাতে এই সময়টুকুই পাইনি। কাল রাতে ই-মেলে আমার গোপন আই. ডি. খুলে দেখি, আমাদের এজেন্সি একটা খুব জরুরি কাজ করাতে চাইছে। আজকের মধ্যে নামাতে হবে। আমি রিগ্রেট করলাম। ওরা চ্যাট করতে চাইল।

চ্যাটিং-এ ওরা বলল, মালটাকে, সরি এই লোকটাকে সময় দেওয়া যাবে না। তার জন্যে দশ পর্যন্ত দিতে রাজি।

আমি লোভে পড়ে গেলাম। দশ বেশ বড় ফিগার।

পরিষ্কার বললাম, তাহলে ওদেরকেই আমার প্রয়োজনীয় সব ইনফর্মেশন প্রোভাইড করতে হবে। আজ সকালের মধ্যে।

ওরা রাজি হয়ে গেল। আমি পরপর লিখে দিলাম, কী-কী চাই।

একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। প্রত্যেক কাজের আগের দিন এরকম হয়ে থাকে। বেলা ন'টায় ঘুম ভাঙল।

চা খেতে-খেতে ল্যাপটপ চালিয়ে দিয়েছি। ইনবক্সে একটাই মেসেজ। ওদের। এগারোটায় পার্ক স্ট্রিট ময়দানের নেহরু স্ট্যাচুর পিছনে ঝোপের মধ্যে মুখবন্ধ একটা কালো ফোল্ডার পড়ে থাকবে। টাকা পাঠাবে। আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর জানতে চেয়েছে। সতেরো নম্বর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা জানিয়ে দিলাম।

এদের পেশাদারিত্বের কোনও তুলনা হয় না। ফোল্ডারের মধ্যে আলাদা-আলাদা খামে লোকটার যাবতীয় পরিচয়। এমনকী তার পাসপোর্টের জেরক্স পর্যন্ত। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে পোর্ট্রেট রয়েছে। আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার হাজির হওয়ার ছবি।

লোকটার নাম জিতেশ শর্মা। কলকাতার সবচেয়ে বড় প্রোমোটার। নেচার গ্রুপ। রাজারহাট-ভি আই পি সবমিলিয়ে প্রায় একশোটা ম্যাগনাম প্রজেক্ট করছে। কোটি-কোটি-কোটিপতি। লোকটির সরকারি উঁচু মহলে ব্যাপক প্রভাব। এক মন্ত্রীর সঙ্গে দারুণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আবার আরেকটি খামে সমস্ত মন্ত্রীদের প্রোগ্রাম সিডিউল দিয়ে দিয়েছে। আমি পাতা উলটে দেখলাম, লোকটির ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীমশাই এইমুহূর্তে দেশের বাইরে। কাল ফিরছেন।

সেকেন্ডের মধ্যে মগজের কোষে সিগন্যাল—বিপ্‌বিপ্‌। চটপট একটা নতুন মোবাইল ফোনে নতুন সিমকার্ড ভরলাম। তারপর ফোন করলাম ওর মোবাইলে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় আমার স্যান্ট্রো এসে দাঁড়াল জিতেশের বাড়ির সামনে। বাইরে তখনও রোদের কড়া ঝাঁজ।

আগাগোড়া মার্বেলের সাতমহলা বাড়ি। পুরোন আমলের। রেনোভেট করা হয়েছে। চারদিকে অনেকখানি বাগান। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড।

সানগ্লাসটা চোখ থেকে খুলেছি। টাইয়ের নট ঠিক করতে-করতে

ফটকের সামনে দাঁড়ালাম। সিকিউরিটির লোক এগিয়ে এল।

আমার ভিজিটিং কার্ড এবং মন্ত্রীর নাম ও অশোকস্তম্ভ ছাপা খাম একসঙ্গে এগিয়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে স্যালুট।

সামনের ড্রইংরুমে বসলাম। সিকিউরিটির একজন চলে গেল ভিতরে।

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, মন্ত্রীর চিঠিসহ খাম এবং আমার ভিজিটিং কার্ড দুটোই ডাহা জাল।

আধমিনিটের মধ্যে সিকিউরিটির লোকটি ফিরে এল। আমায় ভিতরে ডাকল।

বিরাট করিডরের শেষপ্রান্তে ঘর। টকটকে ফরসা, প্রায় ছফুট লম্বা সুপুরুষ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

স্মিত হেসে জিতেশ বলল,—নমস্তে। আইয়ে।

—গুড আফটারনুন।

—বইঠিয়ে।

—থ্যাঙ্ক য়ু।

আমি এই মুহূর্তে একজন অনাবাসী বাঙালি। স্টেট্‌সে আছি প্রায় তিরিশ বছর। মাল্টি ন্যাশন্যাল কর্পোরেট হাউসের বড় অংশীদার। কলকাতার টাউনশিপ প্রোজেক্টে টাকা লাগাতে চাই।

ইংরাজি মেশানো ভাঙা বাংলায় সেটাই বুঝিয়ে বললাম। জিতেশ দারুণ উৎসাহী। টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিউ টাউনের ম্যাপ খুলে বসল। কোথায়-কোথায় ওর জমি নেওয়া আছে, দেখাল।

সুদৃশ্য কাপে চা-বিস্কুট এসে গেছে। দু-চুমুক মেরে রেখে দিয়েছি। আমি জানি, এটাই ভদ্রতা। এর মধ্যে জিতেশ বেল টিপে বেয়ারাকে বলে দিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে। কেউ যেন না আসে।

প্রায় দশ মিনিট আমাদের আলোচনা চলল। শেয়ার নিয়ে দরাদরি, শেয়ারের পার্সেন্টেজ, কত ডলার আমায় দিতে হবে এইসব ব্যাবসাদারি কচকচি।

কথা শেষ। আমি হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি ভীষণ হ্যাপি। আয়্যাম ওলসো গ্রেটফুল টু দ্য মিনিস্টর।

হি হ্যাস গিভ্‌ন য়োর ইন্ট্রোডাকশন।

জিতেশ হেসে বলল, ম্যায় ভি বহোত খুশ হুঁ।

—দেন য়ু আর প্রিপেয়ারিং দ্য পেপারস?

—জরুর। কাল ইভনিং-এর অন্দর সোব রেডি করে ফেলব।

—দেরি হয়ে যাবে না তো?

—কিঁউ? কেন? নেহি জি, উসসে পহলে ক্যায়সে হোবে? আমাদের লিগাল অ্যাডভাইসারের সাথে কথা কোরতে হোবে। ফির উনসে দো কোম্পানির পার্টনারশিপ চেঞ্জ—

—না-না জিতেশজি! আয়্যাম নট সেইং দ্যাট। বলছি, অত সময় কি আমরা পাচ্ছি?

—কেন? কেয়া প্রোবলেম?

—নো-নো। তেমন কোনও প্রবলেম অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না জিতেশজি। তবে কি জানেন, ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস।...ওকে সার, বেস্ট অব লাক। গো অ্যাহেড।

আমি ডানহাত বাড়িয়ে দিয়েছি। জিতেশ সাগ্রহে হাত বাড়াল। ওর হাত ধরে সজোরে হ্যান্ডশেক করতে-করতে বললাম, থ্যাঙ্ক য়ু, থ্যাঙ্ক য়ু সার।

উঃ!—জিতেশ ককিয়ে উঠেছে।

কী হল? লাগল?—আমি হাত ছেড়ে দিয়ে অবাক হওয়ার নিখুঁত অভিনয় করলাম। যাক! আমার কাজ শেষ।

জিতেশ মুখে হাসি টানার আপ্রাণ চেষ্টা করে বলল, নেহি। ঠিক হ্যায়।

কিন্তু ও তখন ভ্রূ কুঁচকে নিজের ডানহাতের তালু দেখছে। ফুটে উঠেছে সেখানে ফোঁটা-ফোঁটা রক্তবিন্দু।

এরপর কী ঘটবে, আমার জানা। একমুহূর্ত সময় নেই। পিছনে আমি কখনও তাকাই না। একহাত সুইংডোরে। অন্য হাত নেড়ে জিতেশকে বিদায় জানালাম। গুডবাই জিতেশ শর্মা। গটগট করে হাঁটতে শুরু করেছি করিডর দিয়ে।

পটাসিয়াম সায়ানাইডের মাইক্রো-সিরিঞ্জ ঢুকে গেছে সুটের পকেটে।

ঢুকে গেছে একজোড়া ফিনফিনে গ্লাভসও।

পোর্টিকো পর্যন্ত এসে গেছি। সিকিওরিটির ছেলেটা স্যালুট ঠুকল। পাঁচশো টাকার নোট এগিয়ে দিলাম। ফের স্যালুট। গেট খুলে গেল।

সন্ধে হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি, হঠাৎ বদলে গেছে আবহাওয়াও। জোরে-জোরে হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা। সোডিয়াম ভেপারের আলোয় দেখলাম, ফরফর করে পাতাপুতি, ধুলো উড়ছে। ঝড় আসছে নাকি?

গাড়ি স্টার্ট করলাম। আজ আর আমি বাড়ি ফিরছি না। বউকে বলা আছে। থাকি কেষ্টপুরে। যাচ্ছি বেহালায়, বন্ধুর বাড়ি।

এসি গাড়ি। তবু বোঝা যাচ্ছে, বাইরে বেশ ঝড় উঠেছে। ধুলোর ঘূর্ণি। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের দু-পাশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন, হকাররা ছুটছে মাথা বাঁচাতে।

আমার সুজুকি বউবাজার মোড়ে এসে পড়েছে। সামনের উইন্ডস্ক্রিনে বড়-বড় দু-চার ফোঁটা পড়ল। চালে বৃষ্টির শব্দ।

এসপ্ল্যানেডের ময়দান মেট্রো স্টেশন পেরিয়ে রেড রোড কানেকটারে পড়েছি। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। প্রবল বাতাসে দু-ধারের গাছগুলো মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

রেড রোডে একটাও গাড়ি নেই। পুরো ফাঁকা। উইন্ডস্ক্রিন পুরো ঝাপসা। অবিরাম ওয়াইপার চলেও কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। কড়কড় করে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সরু-সরু গাছগুলো নুইয়ে পড়ছে রাস্তার দিকে।

নাঃ! অন্ধের মতো আর এগোনো ঠিক হবে না। গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিয়েছি।

হঠাৎ মনে পড়ল, আরে! আমার পকেটে নতুন মোবাইল, সিরিঞ্জ, গ্লাভস সব পড়ে আছে। গাড়ি থামালাম। বাঁ-দিকের জানলা খুলে হাত বাড়িয়ে সবসুদ্ধ ছুঁড়ে দিলাম ময়দানের দিকে। ভালোই হল। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে যাবে।

কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁটে গাড়ির সামনের সিট ভিজে চুপচুপে।

বাপরে! একী ভয়ংকর কালবোশেখি! আজ কি গোটা আকাশ ভেঙে

পড়বে?

খুব আস্তে-আস্তে স্যান্ট্রোকে রাস্তার ধারে পার্ক করলাম। চাকায় ছপছপ শব্দ। ময়দান উপছে রেড রোডের দুপ্রান্তে জল উঠে এসেছে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। মাঝে-মাঝে এমন দমকা ঝড় দিচ্ছে, গাড়িটা দুলে উঠছে।

এখনও শেষ কাজটুকু বাকি। আমার গাড়ির সামনে-পেছনে ওরিজিন্যাল নাম্বারপ্লেট দুটোর ওপর ডিজিটাল ফ্রেক্সের ভুয়ো নাম্বারপ্লেট সাঁটা আছে। বৃষ্টি থামলে ও দুটো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ব্যস, সব প্রমাণ শেষ।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেওয়া দরকার। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। সর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে যেতে পারে। তা ছাড়া এতক্ষণে হয়ত আপনাদের, মানে পুলিশের কাছে ভুয়ো নাম্বারটা পৌঁছে গেছে। রিস্‌ক হয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলাম। এসি বন্ধ করলাম। তারপর এঞ্জিন।

ওঃ, কেন যে করলাম! তারপর...হ্যাঁ...তারপরই সেই ভয়ংকর...উঃ! গলা শুকিয়ে গেছে...আরেকটু জল দেবেন?...বলছি।...আঃ।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি ধরে এল। পিটপিট করে পড়ছে। দু মিনিটের মধ্যে সেটুকুও বন্ধ। গাছের পাতা দিয়ে এখনও দু-চার ফোঁটা টপটপ করে পড়ছে। রুমাল দিয়ে উইন্ডস্ক্রিন মুছে ফেললাম। হলুদ আলোয় সুনসান রেড রোড। বাঁ-দিকে অন্ধকার ময়দান।

গাড়ি থেকে নামতে হবে। সবচেয়ে আগে নাম্বারপ্লেট দুটো ছিঁড়তে হবে।

চেষ্টা করতেই প্রবল ঝাঁকুনি খেলাম। ধুর! সিটবেল্টটা খুলতে ভুলে গেছি।

আরে! এ কী! কী হচ্ছে? সিটবেল্টটা খুলছে না কেন? দেখি তো। জ্যাম হয়ে গেল? দু-হাত দিয়ে খুব চেষ্টা করলাম। তবু ক্লিপ লকটা কিছুতে আলগা হচ্ছে না।

এসি বন্ধ। বেশ গরম লাগছে। জানলা খুলে দিই। হাওয়া আসুক। আমার গাড়ির পাওয়ার উইন্ডো। ডানহাত দিয়ে বোতাম টিপলাম।

আশ্চর্য। জানলার কাচ একচুল নামল না।

কী হচ্ছেটা কি! নতুন বিদেশি গাড়ি, একবছরও হয়নি। এরমধ্যেই বিগড়ে গেল? ছটফট করছি, বেল্টটা ধরে টান দিচ্ছি। মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছি, কোনও ফল হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, ক্রমশ যেন ফাঁস হয়ে চেপে বসছে বুকের ওপর। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

আবার জানলার বোতাম টিপলাম। নাহ্!

ভিতরে ভ্যাপসা গরম বাড়ছে। দেখি, দেখি, স্টার্ট করি। তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে চলে যাই কোনও কারখানায়। ওরা নিশ্চয়ই পারবে। স্টার্ট করলে এসিও চালানো যাবে।

তাড়াতাড়ি চাবিটা ঘোরালাম। ও মাই গড্! ক্যাঁচ্-কট্-কট্। চাবিটা ডানদিকে পুরো ঘুরে গেল। এঞ্জিন একটুও শব্দ করল না।

মানে? ব্যাপারটা কী? এতক্ষণ দিব্যি চলছিল। কয়েকমিনিটের মধ্যে পুরো গাড়িটা অকেজো হয়ে গেল? হাউ ইস ইট পসিব্ল?

আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর ভাবতে পারছি না। দরদর করে ঘামছি। গরমে, আতঙ্কে। শুধুমাত্র আমার দুটো হাত নড়াচড়া করতে পারছে। শরীরটা এঁটে আছে সিটের সঙ্গে।

না-না, এ হতেই পারে না। আবার, আবার চেষ্টা করলাম। প্রাণপণে মোচড় দিচ্ছি চাবিতে। কিছুই হচ্ছে না। সুজুকি পাথর। নিঃশব্দ।

তাই তো। ভুলেই গেছি। আমার কাছে তো এখনও একটা মোবাইল আছে। নিজের ওরিজিন্যালটা। মোবাইলে কোনও বন্ধুকে ডেকে পাঠাই। ছুটে এসে আমায় রেসকিউ করবে।

প্যান্টের বাঁ-পকেট থেকে কষ্টেসৃষ্টে ফোনটা বের করলাম। বোতাম টিপলাম।

য্-যা! মোবাইলে কোনও টাওয়ার নেই। আজ হচ্ছেটা কি? এটুকু জলঝড়ে সব বারোটা বেজে খারাপ হয়ে গেল? সবকিছু একসঙ্গে এখনই হচ্ছে?

আর কিছুক্ষণ! কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিতরের অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে। দম আটকে মরে শুয়ে থাকব নিজের গাড়িতে! কেউ জানতেই পারবে না।

কী করি, কী করি? কেউ কি দেখতে পাবে আমার গাড়ি? পিছনে

একটাও গাড়ি দেখছি না রাজপথে। বহুদূরে দুটো লাল বিন্দু। মনে হল, একটা টাটা সুমো সাঁ করে চলে গেল খিদিরপুরের দিকে।

না-না, এত সহজে আমি মরব না। যে আমি হাসতে-হাসতে এত মানুষ এতরকম কায়দায় মেরেছি, সে মরে যাবে এইভাবে?

ড্যাশবোর্ডের নীচে টেপডেক-রেডিও। ওটা চলবে কি? সবই তো বিকল। দেখি, দেখি রেডিওটা চলে কিনা। অন্তত এফ এমে মানুষের গলা শুনতে পাব। মনে একটু সাহস পাব। ভাবতে পারব নেক্সট কী করণীয়।

সবক'টা 'নব' পরপর ঘুরিয়ে দিলাম। কোথায় কী? একটাও আলো জ্বলল না।

হঠাৎ! হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে 'ঘড়্‌ড়্-ঘড়্‌ড়্-ঘড়্‌ড়্'! এফ. এম চালু হয়ে গেল? কিন্তু লালনীল আলোগুলো জ্বলছে না কেন?

পরক্ষণেই আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফের স্রোত নেমে গেল।

ঘড়ঘড়ানি আচমকা থেমে গেছে। রেডিওতে বেজে উঠেছে অমানুষিক ঘড়ঘড়ে হাসি!

আমি...আমি আতঙ্কের শেষ সীমায়! প্রাণপণে চেঁচাতে চাইছি, গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। আমি কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি?

তারপর...তারপর!

—কেয়া বীরেশবাবু, আব তেরা কেয়া হোগা?

কে-এ? কে? কার গলা?

—ইখনও হামায় পহচানতে পারনি? বাঃ, বীরেশ বাঃ।

—ত্-তুমি...ত্-তুমি...

—হ্যাঁ, বোল, বোল। ইখনও হামি পড়ে আছি ওপিসঘোরে। সবলোগ চিল্লামিল্লি কোরছে, ডাগদার পুলিশ ভি ইসে গেছে। লেকিন হামি? হাঃ-হাঃ-হামি ফ্রি। বিলকুল ফ্রি। কোই মুঝে মার্ডার করনে নেহি সকেগা। অর তু? তু আভি জিন্দা হ্যায় রে। অব তেরা কেয়া হোগা বোল?

—ত্-তুমি! তুমি জিতেশ! তুমি কী করে...আমায় ছেড়ে দাও জিতেশ। আ-আমি ক্ষমা চাইছি...

—হাঃ-হাঃ-কেয়া মজে কি বাত। তুকে ছেড়ে দিব? কিউ রে? কিতনা আদমিকো তু কাতিল কোরেছিস। স্রিফ রুপয়াকে লিয়ে।

—হ্যাঁ, করেছি, করেছি। আমি, আমি খুনি। মার্ডারার। বিশ্বাস করো, এই লাইন ছেড়ে দিতে চেয়েছি। পারিনি। ওরা ছাড়ছে না।

—ঝুট্! পুলিশকে বোলিস নাই কেন?

—বলব, এবার বলব। একবার আমায় সুযোগ দাও, বলব। সব বলব।

—ইখনই বোলবি? কনফেস কোরবি?

—করব, এখনই করব।

—সাচ বোলছিস? বিশওয়াস কোরবো? দেখ্ হারামিকে বাচ্চে, অগর তুনে কোই উলটাসিধা কোরবি তো, তেরা বাঁচনেকা কোই রাস্তা নেহি হ্যায়। ইয়ে লাস্ট চান্স। হামি তুর পিছেই লাগে আছি।

রেডিওটা ঘরঘর করে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে জানি না, চোখ মেললাম। তাকিয়ে দেখি, আমার গাড়িটা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে নির্জন রেড রোডে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

ধড়ফড় করে উঠে সিটবেল্টের ক্লিপটায় চাপ দিলাম। কী আশ্চর্য! একবারে খুলে গেল।

জানলার বোতামে চাপ দিলাম। একবারেই কাচ মসৃণভাবে নেমে গেল। যেমন হয়। হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দিল।

চাবি ঘোরালাম। একবারেই গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেল!

রেডিও চালালাম। মিউজিক বেজে উঠল।

আমি কি তবে এতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম? ভাবতেই কেঁপে উঠলাম। দুঃস্বপ্ন? না-না, এটা সত্যি! আমার লাস্ট চান্স। জিতেশ আমায় ছাড়বে না। উঃ!

আমি আর কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না অফিসার। সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছি আপনার থানায়। আপনাদের শাস্তি নিতে আমি তৈরি। আপনি আমায় অ্যারেস্ট করুন। আমি বাঁচতে চাই।

বাসা বদল

একতলা বাংলো বাড়ি। সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে বাজারের দিকে। পিছনে একফালি জমিতে কয়েকটি কাঁঠাল, আম, জাম, নিম গাছ। আগাছা, ঝোপঝাড়। প্রায় ডোবার মতো ছোট্ট একটা পুকুর। পাশে কুয়ো। পাঁচিলের ওপারে ধু-ধু ধানখেত।

শ্যামলী দেবী ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন। ভালো লাগছিল। এই কোয়ার্টারটা শহরের বাইরে। শান্ত পরিবেশ, হই-হট্টোগোল নেই। উটকো লোক যখন-তখন উপদ্রব করবে না। অনেক দিনের শখ, বাগান করা। ফুলের বাগান। এবার সাধ মিটবে।

তবে সে আর কতদিন। বড়জোর দু-তিন বছর। তারপরেই তো 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনখানে'। ফের বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে নতুন ঠিকানা। পুলিশ তো নয়, যেন ভবঘুরের জীবন।

আজকের দিনটাই তো তেমন। সেই সকাল থেকে চলেছে গুছিয়ে ফেলার কাজ। মালপত্র কালকেই এসে গেছিল। পৌঁছবার পর থেকে মুখ তোলার ফুরসত পাননি। তবু বহুদিনের পুরোনো হাবিলদার সুবোধ ছিল। হাতে-হাতে এগিয়ে দিয়েছে। কর্তার তো এ সব কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গাড়িতে মা-মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে সোজা অফিস। থানার চার্জ বুঝে নিতে হবে।

সবচেয়ে ক্ষতি হয় দোলার লেখাপড়ার। মেয়েটা বুদ্ধিমতী। লেখাপড়ায় মন আছে! হলে হবে কী, বাবার চাকরির কল্যাণে বেচারি একটু থিতু হতে পারে না। দু-বছর হল কি হল না, পুরোনো স্কুল, বন্ধুদের ছেড়ে নতুন স্কুল, নতুন পরিবেশ। ভালো মাস্টারও পাওয়া যায় না সবজায়গায়। কোথাও শহুরে পরিবেশ, কোথাও আবার গণ্ডগ্রাম।

ভাবতেই রাজ্যের চিন্তা ঢুকে এল মাথায়। এই নিশিগঞ্জ কেমন হবে? ভালো স্কুল, মাস্টার পাওয়া যাবে তো? তাছাড়া একজন সবসময়ের কাজের মেয়ে লাগবে। কাল সুবোধ এলে ওকে খোঁজখবর নিতে পাঠাতে হবে।

—মা, মা! তুমি কোথায়?

দোলনের ডাকে শ্যামলীদেবীর ঘোর কেটে গেল। তাই তো! মেয়েটা একেবারে একলা আছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে।

যা-ই।—শ্যামলী দ্রুত বাড়ির সামনের দিকে ঘুরলেন।

না, দোলন একা নেই। একজন মহিলার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছে। ওঁকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল।

আসুন।—ভদ্রমহিলা একগাল হেসে বললেন, আমার নাম মলিনা! খবর পেয়ে আলাপ করতে চলে এলুম।

খুব ভালো করেছেন।—শ্যামলীও হাসলেন, আমি শ্যামলী। আসুন, ভিতরে আসুন।

মহিলাকে প্রথম দেখাতেই তাঁর ভালো লেগে গেছে। মোটেই আর পাঁচজন গ্রামের বউ-মেয়েদের মতো নয়। সুশ্রী ছিপছিপে দেহারা। কথাবার্তা ভাবভঙ্গিতে রুচির পালিশ রয়েছে।

বাইরের ঘরে চেয়ারে বসতে-বসতে শ্যামলী বললেন,—চা খাবেন তো? একটু চা করি?

আপনি ব্যস্ত হবেন না।—মলিনা বললেন, আমার চায়ের অব্যেস নেই। আপনি বসুন, একটু কথা বলি। এই পাড়াদেশে দুটো মনের মতো কথা বলার লোক পাই না। আপনাকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।

—আমারও। একেবারে ঠিক কথা বলেছেন দিদি। বেশিরভাগ জায়গায় তো সময় কাটতে চায় না। কী করি, ঘরদোরের কাজকর্ম সেরে বই নিয়ে বসে যাই। আমার মেয়েও লক্ষ্মী। স্কুল থেকে ফিরে একা-একা বেচারি ঘুরে বেড়ায়, নয়ত পুতুল খেলে। তেমন বন্ধু পেলে তো! তবু এখানে আপনাকে..., কাছেই থাকেন বুঝি? কোয়ার্টারে?

—হ্যাঁ। অনেক দিন একা-একা! মাঝে-মাঝে দম আটকে আসে। উপায় নেই। যতদিন না উপরওয়ালার নোটিস আসছে, পড়ে থাকতে হবে।

—আপনার ছেলেমেয়ে?

—আপনার মতো। একটাই মেয়ে।

—তা-ই? এমা—ওকে নিয়ে এলেন না কেন? দোলার সঙ্গে খেলত। ওর বন্ধু হতো। বড় বুঝি?

—না-না, প্রায় ওরই বয়েসি। একটু চুপচাপ গোছের, কারও সঙ্গে বিশেষ মিশতে চায় না। দেখি, কাল নিয়ে আসব।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আনবেন। এক কাজ করুন না, ইস্কুল থেকে ফিরলে একটু আগে-আগে পাঠিয়ে দিন। আপনি হাতের কাজ সেরে পরে আসুন। বাচ্চারা মনের মতো সঙ্গী পেলে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়ে যায়।

—ঠিক আছে। আজ তাহলে উঠি?

—আর একটু বসুন। এই তো এলেন। দিদি, আপনার কর্তা কোথায় আছেন?

—পুলিশে।

—পুলিশে? বাব্বা, কী মিল আমাদের! এই থানায়?

—আগে ছিলেন। এখন—

—বদলি হয়ে গেছেন, তাই না? নতুন জায়গায় বাসা পাননি, আপনাদের নিয়ে যেতে পারছেন না। বড় সায়েবরা দুমদাম বদলির অর্ডারে সই করে দেয়, একবার ফিরেও দেখে না অফিসারদের সুবিধে-অসুবিধে। ওদের আর কী, বলুন? কী বলব দিদি, এইসব যন্ত্রণায় আমার তো পুলিশের

চাকরি দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গেল। বাইরে থেকে লোকে ভাবে, কত বড় চাকরি, কত টাকা, কত ক্ষমতা।

—যা বলেছেন! আমার তো জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।

বলতে-বলতে হঠাৎ মলিনার গলা ধরে এল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন। শ্যামলী অপ্রস্তুত। হয়ত না জেনে মলিনার কোনও গোপন ব্যথা ছুঁয়ে ফেলেছেন।

মলিনা উঠে দাঁড়ালেন। চোখ ছলছল করছে। বললেন,—আজ যাই। কাল ফাঁক পেলে চলে আসব।

—নিশ্চয়ই। আমি অপেক্ষা করে থাকব। যত তাড়াতাড়ি পারেন। আর মেয়েকে বলবেন, যখন খুশি চলে আসতে।

কথায়-কথায় কেউই খেয়াল করেননি, সন্ধে পার হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, জোনাকি উড়ছে।

বাইরে গ্রিল গেটে আলতো শব্দ হল, মলিনার শরীর মিশে গেল অন্ধকারে।

—এ কী গো! সারা বাড়ি যে অন্ধকার। আলো জ্বালাওনি?

টুপিটা হাতে নিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন অমিয়নাথ চৌধুরী।

জ্বালাচ্ছি বাবা, জ্বালাচ্ছি।—শ্যামলী আপশোসের সুরে বললেন,—ইস্‌স্‌, একটু আগে এলেই দেখা হয়ে যেত। খুব মিশুকে মহিলা। এইমাত্র গেলেন। দুজনে সুখদুঃখের কথা বলতে-বলতে সব ভুলে গেছি। কথা বলার লোক তো পাই না।...তোমার আর কী, সারাদিন লোকজন নিয়ে হইহই করছ, ধমকাচ্ছ, চোরডাকাত ঠ্যাঙাচ্ছ, আমার যে কীভাবে সময় কাটে—!

—এই দ্যাখো, আবার ফাটা রেকর্ড বাজাতে শুরু করলে! কার কথা বলছ? কে এসেছিলেন?

—মলিনা। ভারি ভালো মেয়ে। আমারই বয়েসি হবে। আমাদের মতন একটাই মেয়ে। বলল তো দোলারই বয়েসি।

—বাঃ, তবে আর কী! মা-মেয়ে দুজনেই সঙ্গী পেয়ে গেলে। এই এলাকার বাসিন্দা?

—না গো, সেও ভারি ইন্টারেস্টিং। সেখানেও আমাদের মিল।

পুলিশ ফ্যামিলি। কর্তা এই থানাতে আগে ছিলেন। বদলি হয়ে গেছেন। বাসা পেলে বউবাচ্চাকে নিয়ে যাবেন।

—এই থানাতে ছিলেন? কী নাম?

এ-হে-হে! —শ্যামলী জিভ কেটে বললেন,—দেখেছ, কথায়-কথায় ওর কর্তার নামটা জিগ্যেস করতেই ভুলে গেছি। তুমি নিশ্চয়ই চিনবে। কাল ঠিক জেনে নেব।...চা করি?

—করো। আমি গায়ে জল ঢেলে আসছি। শোনো, সঙ্গে মুড়িটুড়ি থাকলে দিও। পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। টিফিন করার সময় পাইনি।

—বলো কী গো! এত কাজের চাপ?

—চাপ মানে? বাপ্‌রে বাপ্‌। ডিস্টার্বড এরিয়া। গোলমাল লেগেই আছে। জমিজমার গোলমাল, তার উপর ডাকাতি। কালকেই রাতে নাকি দু-জায়গায় দুটো মেজর ডাকাতি হয়েছে। একাধিক গ্যাং এখানে অপারেট করছে। সাধে কি আর এখানে আমায় বড়সায়েব ঠেলেছে!

বলতে-বলতে অমিয়বাবু শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

—এই দ্যাখো! মেয়েটা যে ঘুমিয়ে কাদা।...বাবিসোনা, ও বাবিসোনা। ওঠো, উঠে পড়ো। এরপরে রাতে আর ঘুম আসবে না। কাল তোমায় স্কুলে নিয়ে যাব।

মা, মা! একটু আটা দাও তো।

শ্যামলীদেবী দুপুরের রান্না করছিলেন, একটু অবাক হয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে। বাবার সঙ্গে গেছিল নিশিগঞ্জ গার্লস স্কুলে ভর্তি হতে। একটু আগেই অমিয়বাবু নামিয়ে দিয়ে গেছেন।

—আটা! আটা দিয়ে কী করবি?

—গোল্লা পাকাব।

—গোল্লা?

—হ্যাঁ, গোল্লা। ছোট্ট-ছোট আটার গুলি। মাছের টোপ হবে। বড়শিতে গেঁথে মাছ ধরব।

—মাছ ধরবি? কোথায় রে?

—কেন, আমাদের এই পুকুরে।

—ওই ডোবায়? দুর! ওতে মাছ আছে নাকি? তোর যেমন বুদ্ধি।

—হ্যাঁ মা, আছে। তুমি দাও তো!

—দিচ্ছি, বাবা দিচ্ছি। কিন্তু ছিপ-বড়শি পাবি কোথায়? বাবা কিনে দিয়েছে বুঝি?

—না-না, কিচ্ছু কিনতে হয়নি। আমাদের এখানেই ছিল। তাড়াতাড়ি দাও।

দোলনের আর তর সইছে না। উৎসাহে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

শ্যামলী বাটিতে একমুঠো আটা ঢেলে দিলেন। দোলন একছুটে চলে গেল বাড়ির পিছন দিকে।

এখানে ছিপ-বড়শি পেল কোত্থেকে? অমিয়বাবুর তো কোনোকালে মাছ ধরার বাতিক ছিল না। এই কোয়ার্টারে আগে থেকেই ছিল? খুঁজে পেয়েছে? হয়ত আগে যারা থাকতেন, তাদের ফেলে যাওয়া জিনিস।

তরকারি কড়াই থেকে বাটিতে নামিয়ে স্টোভ নেভালেন শ্যামলী দেবী। হাত মুছে বেরিয়ে এলেন।

ওই তো! দোলা চুপ করে ডোবার ধারে বসে আছে। ছিপ ফেলে। পাশে একটা কাগজের ওপর আটার ছোট-ছোট গুলি পাকানো।

আশ্চর্য! পাশে একটা চকচকে পুঁটি মাছও শুয়ে আছে। দোলা এর মধ্যে মাছ ধরতেও শিখে গেছে।

মেয়ের পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামলী দেবী। ছিপের ফাতনা কাঁপছে তিরতির করে। একেকবার টুক করে সোজা হচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে।

দোলা ফিসফিস করে বলছে,—অ্যাই লিলি, কী করব? টানব? কীরে, কথা বলছিস না কেন? এবার টানব? বল্—কীরে?...আচ্ছা—

ছিপ ধরে সজোরে টান দেয় দোলা। শূন্যে পাক খেয়ে সুতো-ফাতনা ছিটকে আসে ডাঙায়। বড়শিতে গেঁথে আছে আরেকটা পুঁটি, ছটফট করছে।

আর তখনই মাকে দেখতে পেয়ে গেল দোলা। আনন্দে চনমন করছে।

—তুমি! দেখলে মা, দেখলে? এর মধ্যেই দু-দুটো মাছ ধরে

ফেলেছি। এই পুকুরে অনেক মাছ আছে। লিলি, লিলি কোথায় গেল বলো তো? দেখেছ ওকে?

লিলি!—শ্যামলী ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, আমিই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তোর পিছনে।

—সে তো দেখছিই। ওখানে লিলিও ছিল। ওকে দ্যাখোনি? বলছ কী? লিলিই তো আমায় সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিল। কীভাবে বড়শিতে টোপ পরাতে হয়, ছিপ ফেলতে হয়, ফাতনা নড়লে ছিপে টান মারতে হয়, সব। বলল, মাছ ধরার সময় কথা বলতে নেই। জলের মধ্যে শব্দ হয়, মাছ পালিয়ে যায়। ছোট ঘরটা থেকে ছিপ খুঁজে দিল। কুলুঙ্গির ওপর রাখা ছিল, আমি পেড়ে আনলাম। ও এই বাড়ির সব চেনে।

—লিলিটা কে, সেটা বলবি তো? যে ইস্কুলে গেলি, ওখানে পড়ে? আজ আলাপ হল বুঝি?

—ধ্যাৎ! তুমি না মা, একেবারে ইয়ে! লিলিকে চিনছ না? কাল যার কথা বলছিলে। ওই মলিনা কাকিমার মেয়ে।

—মলিনার মেয়ে? দ্যাখো কাণ্ড! সে এসে গেছে? তোর সঙ্গে ভাবও হয়ে গেছে? ভালো, খুব ভালো! আমায় দেখে লজ্জা পেয়ে লুকোল বুঝি? খুব দুষ্টু তো! দ্যাখ্, দ্যাখ্, ধরে নিয়ে আয় ওকে।

দোলা ছিপ-টিপ ফেলে ছুটল। শ্যামলী খুব খুশি। যাক্ এতদিনে মেয়েটার একটা সঙ্গী জুটল। সারাদিন বেচারি একা, মনমরা হয়ে থাকে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে দোলা হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরে এল। ঠোঁট ওলটাল।

—কীরে, বন্ধুকে খুঁজে পেলি না? এইটুকু তো বাড়ি।

—না মা, সব জায়গায় খুঁজলাম।

—তুই একটা ভোঁদা। ভালো করে দ্যাখ্, খাটের তলায়-টলায় লুকিয়ে আছে। বা হয়ত ওই ছোট ঘরটার কোথাও—তুই তো বললি, ও আগে এই বাড়িতে এসেছে। কোথায় কী আছে, সব জানে।

—এসেছে কী মা! লিলি বলল, ওরা আগে এই কোয়ার্টারেই থাকত!

—এখানেই থাকত? ওর বাবা কি এই থানার বড়বাবু ছিলেন?

—তা বলতে পারব না। অতসব কিছু বলেনি।

—জিগ্যেস করবি তো! তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু। কাল ওর মা অবশ্য বলল, কাছেই থাকে। ওর বাবা বদলি হয়ে গেছেন। বাসা পেলে নিয়ে যাবেন। এতক্ষণ একসঙ্গে আছিস. কোনও কথাটাই ঠিকঠাক বলতে শিখলি না।...আমি যাই, মাছের ঝোল বাকি আছে। লিলি এলে আমার কাছে নিয়ে আসিস। একটু মিষ্টি-টিষ্টি দেব। ছোট্ট মানুষ, এই প্রথম এল।

শ্যামলী বাড়ির দিকে হাঁটলেন। মেয়েটা বড্ড লাজুক। মলিনা বলেছিল। মায়ের ঠিক উলটো।

বাইরের ঘর পেরিয়ে বাঁ-দিকে রান্নাঘর, ডানদিকে শোবার ঘর। বড় চৌকি পাতা। শ্যামলী থমকে দাঁড়ালেন।

বিছানার চাদর লন্ডভন্ড, কুঁচকে গেছে। সাদা চাদরের ওপর কাদা-পায়ের ছাপ। ছোট-ছোট পা। এইমাত্র যেন বাচ্চারা খাটে উঠে হুটোপাটি করে গেছে।

ওফ্, এদের নিয়ে পারা যায় না! নিশ্চয়ই লিলি আর দোলা খাটে উঠে লাফালাফি করেছে। একা থাকলে দোলা খুবই শান্ত। যেই বন্ধু পেয়েছে, অমনি লাগামছাড়া।

রাগে গা জ্বলে গেল শ্যামলীর। নাঃ, লিলি চলে গেলে দোলাকে কষে বকুনি দিতে হবে। সদ্য কাচা চাদর, আজই পেতেছেন। এই অবস্থা করে ছেড়েছে! এখন আবার নতুন একটা পাততে হবে। এতে তো আর রাতে শোওয়া যাবে না।

নিজের মনে গজগজ করতে-করতে শ্যামলী রান্নাঘরে ঢুকলেন।

—বউদি! বউদিমণি!

সুবোধ ডাকছে। কাল বিকেলে গেছে, আজ এতক্ষণে এল। পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, সকাল হলেই চলে আসতে। মহা ফাঁকিবাজ।

—ব্যাপারটা কী সুবোধ? এখন ক'টা বাজে বলো তো? কাল তোমায় কী বলে দিয়েছিলাম?

—বউদিমণি, ইস্টিশনে গেছিনু। সার টিকিট কাটতে পেইঠেছিলেন। লম্বা লাইন ছেল।

—ট্রেনের টিকিট? কার?

—আপনাদের গো বউদিমণি। সার এই চিঠি দেছেন।

সুবোধের হাত থেকে শ্যামলী চিরকুটটা নিয়ে পড়ে ফেললেন। দোলার বাবার চিঠি। তিন লাইনের চিঠি। 'আজ রাতেই কলকাতা যেতে হবে, মার শরীর খারাপ। রেডিওগ্রাম এসেছে। জামাকাপড়ের ব্যাগটা গুছিয়ে নিও।'

ঠিক তখনই বাড়ির পিছনদিক থেকে দোলা দৌড়ে এল।

—মা! এই দ্যাখো! আজ আটটা পুঁটিমাছ ধরেছি।

দোলার চোখেমুখে খুশি জ্বলজ্বল করছে। মেয়েকে বকতে গিয়েও কিছু বলতে পারলেন না শ্যামলী।

—একটু ভেজে দাও না মা!

—দিচ্ছি, একটু সবুর কর। তোর বন্ধুকে নিয়ে আয়।

—লিলির কথা বলছো?

—না তো কী! কোথায় সে?

—ও চলে গেছে মা।

—সে কী রে! তোকে এত করে বললাম, নিয়ে আসতে। প্রথম দিন আমাদের বাড়ি এল।

—বলেছিলাম মা। ও বলল, তাড়া আছে। কাল নিশ্চয়ই আসবে।

—সত্যি, তুই না—! ওকে মাছ দিয়ে দিয়েছিস?

—নিল না মা। আমার থেকে অর্ধেকটা, চারটে দিয়েছিলাম। বলল, ওরা নাকি মাছ খায় না।

—শুয়ে পড়েছ?

—না। কিছু বলবে?

—বলছি, মার কি বাড়াবাড়ি কিছু হয়েছে?

—মনে হচ্ছে। নইলে রেডিওগ্রাম আসত না। আমি তো ধরেই নিয়েছি, তোমাদের এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকতে হবে।

—সেজন্যেই কি তুমি এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে বললে?

—ঠিক সেজন্যে নয়। তোমরা নিশিগঞ্জে থাকলেও আমি বাসা পালটাতাম।

—কেন বলো তো? অত সুন্দর বাংলো-বাড়ি, কতখানি খোলা জায়গা, বাগান-পুকুর। আমার কিন্তু ভারি পছন্দ হয়ে গেছিল। তোমার কি থানা দূরে বলে সমস্যা হচ্ছিল?

—ওইটুকু সমস্যা মানিয়ে নেওয়া যেত। গাড়ি আছে।

—তবে? তবে শুধুমুদু বাসা বদলাচ্ছ কেন? আমরা ফিরে এলে ওখানেই থাকব। আমি একটা সমবয়েসি সঙ্গী পেয়েছিলাম। কী মিশুকে মেয়ে, গল্পে-গল্পে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত। বাবিসোনারও বন্ধু জুটে গেছিল। একদিনেই দুজনে গলায়-গলায় ভাব। আমার তো মলিনার জন্যে মন-খারাপ করছে। হয়ত আর দেখাই হবে না।

—দেখা না হওয়াই ভালো।

—ভালো! কী বলছ?

—হ্যাঁ, আর দেখা না হওয়াই ভালো। দাঁড়াও, কোন স্টেশন এল দেখি।

রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ঘটাং-ঘটাং করতে-করতে থামল। অমিয়বাবু মাথা তুলে দেখলেন, বেলডাঙ্গা। জনশূন্য প্ল্যাটফর্ম। তারপর বললেন,—যা বলছি, ভেবেচিন্তেই বলছি।

শ্যামলী উত্তেজিতভাবে এবার বার্থে উঠে বসলেন।

—কী বলতে চাইছ, খুলে বল! আমার এইসব রহস্য ভালো লাগছে না।

—তুমি ঠিক নিতে পারবে?

—না পারার কী আছে? তুমি বলবে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ওদের ফ্যামিলি ভালো নয়। ওদের সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। এই তো?

বাঃ! তুমি দেখছি, নিজেই সব বলে যাচ্ছ! —অমিয়বাবু ম্লান হেসে বললেন,—হ্যাঁ, আমি খবর নিয়েছি। খবর নিয়ে কিছুই জানতে পারিনি। নিশিগঞ্জের একজন লোকও মলিনা, তার মেয়ে বা কর্তাকে চেনে না। এরকম কোনও পরিবার এই তল্লাটে থাকে না।

শ্যামলী অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন।

একটু থেমে বললেন,—তুমি বলেছিলে, মলিনার স্বামী এই থানাতেই ছিলেন। তাই আমি আজ সকালে থানার রেকর্ড বুক নিয়ে বসেছিলাম। খুঁজতে-খুঁজতে দেখলাম, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে এক দারোগা নিশিগঞ্জ থানার চার্জে ছিল। নরেশচন্দ্র সরকার। তার স্ত্রীর নাম মলিনা; একমাত্র মেয়ের নাম লিলি। স্ত্রী এবং মেয়ে দুজনেরই এক রাতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সম্ভবত সুইসাইড। মা, মেয়েকে বিষ খাইয়ে নিজেও খেয়েছিল।...

শ্যামলী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। তার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

—নরেশ সরকার তার আগেই কোনও একটা অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছিল। সেই অভিমানেই বোধহয় মলিনা...এটা আমার অনুমান। কারণ, এর পরে ফাইল বা রেকর্ডবুক দেখার আর সময় পাইনি। তার পরপর বাড়ির রেডিওগ্রামটাও পেলাম। কতগুলো জমিজমার মামলার বাদী-বিবাদীরা থানায় এসে গেল। শেষপর্যন্ত নরেশ সরকারের কী হয়েছিল, জানি না। অবশ্য জানার ইচ্ছেও নেই।
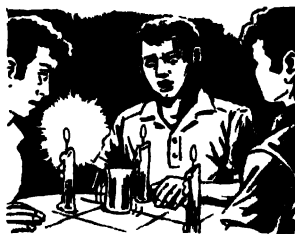
অনেক দূরের বন্ধু

তিন নম্বর চক্কর শেষ করে বেঞ্চিতে বসে পড়ল রণজয়। এবার এক থেকে ষাট গুণবে। তারপর উঠে পড়বে। আবার পুরো পার্ক তিনবার পাক মারবে। ফের এক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে শুরু করবে। এইরকম চলতে থাকবে। দশ রাউন্ড! মোট ত্রিশবার। রণজয়ের ভোরবেলার রুটিন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, কোনও নড়চড় নেই।

ইন্টারস্কুল মিটে ম্যারাথন ইভেন্টে রণজয় এবার ফার্স্ট হয়েছে। ওর স্বপ্ন, এরপর রাজ্য তারপর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া। ছোটবেলা থেকেই ছুটতে ভালোবাসে রণজয়। ওর কোচ নির্মলদা সবসময় বলেন, জীবনটাই এক লম্বা দৌড়। ছোট, ছোট! সব্বার আগে পৌঁছে যাও ফিতের কাছে।

দেখতে-দেখতে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। এই প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম পার্কে ভোরবেলা দৌড় প্র্যাকটিস করে চলেছে রণজয়। মাঠের বেঞ্চি, ঘাস, গাছপালা, মানুষজন সব ওর হাতের তালুর মতো চেনা। এক থেকে চোদ্দো পর্যন্ত গুনেছে, পাশ থেকে হঠাৎ 'পিপ-পিপ'। মোবাইলের মেসেজ আসার শব্দ।

গোনা থেমে গেল। চমকে হাফপ্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল রণজয়। নাঃ, ওর মোবাইল সঙ্গে নেই। থাকেও না কোনওদিন।

শব্দটা এল কোত্থেকে?

ঝুঁকে পড়ে এদিক-ওদিক দেখছে। আরে, ওই তো। বেঞ্চির পায়ার কাছে পড়ে আছে। একটা মোবাইল। মডেলটা দেখতে ঠিক অবিকল ওর ফোনের মতো।

কী করবে? তুলবে? কার ফোন, কে জানে। হয়তো ইচ্ছে করে ফেলে গেছে। খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ে, মোবাইল-ক্রাইম। সেরকম কিছু হতে পারে।

দোনামনা করছে রণজয়। মেসেজটা পড়ার দারুণ কৌতূহল হচ্ছে।

দেখাই যাক না! যদি উলটোপালটা কিছু থাকে, বাড়ি ফেরার পথে থানায় জমা করে দেবে।

সেলফোনটা হাতে তুলে নিল রণজয়। স্ক্রিনে দেখাচ্ছে 'ওয়ান মেসেজ রিসিভড'। বোতাম টিপল।

সঙ্গে-সঙ্গে স্ক্রিনে ভেসে উঠল, 'হ্যাভ য়ু রিসিভড দিস ফোন'?

রণজয়ের ভ্রু কুঁচকে গেল। এ কথার মানে কী?

ও পুটপুট করে আরও বোতাম টিপল। সেন্ডারের জায়গায় স্রেফ তিনটে সংখ্যা। ৭৮৬।

এ কী অদ্ভুত ফোন নম্বর! তবে কি কম্পিউটারে ইন্টারনেট থেকে পাঠানো মেসেজ? কিন্তু সেখানে তো কিছু ইংরাজি শব্দ, যেমন VK-INDIA...এরকম ফুটে ওঠে প্রেরকের জায়গায়। তাহলে...? কীভাবে পাঠাচ্ছে? কে পাঠাচ্ছে? কেন পাঠাচ্ছে?

কী করবে? জবাব দেবে? তীব্র কৌতূহল খুব টানছে।

রণজয় টাইপ করল, 'ইয়েস'।

কয়েক সেকেন্ড। আবার তীব্র শব্দ। পিপ্‌-পিপ্‌। মুহূর্তে জবাব চলে এসেছে।

স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে, 'প্লিজ কিপ দিস ফোন উইদ য়ু। আই'ল টক টু য়ু অ্যাট নাইট। ভেরি আর্জেন্ট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল।

রণজয় সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। ওর গায়ে কাঁটা দিল। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ও কি কোনও র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়ছে? কী চাইছে ওই অচেনা লোকটা? আর কি এগোবে? না থানায় জমা করে আসবে ফোনটা?

এনাফ ইস এনাফ! রণজয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। চটপট বোতাম টিপতে শুরু করল।

'হোয়াট ডু য়ু ওয়ান্ট ফ্রম মি? টেল মি রাইট নাও। আদারওয়াইস আই'ল থ্রো দিস ফোন অ্যাওয়ে।'

মেসেজ পাঠানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জবাব এসে গেল।

'নো মাই ফ্রেন্ড। প্লিজ ডু মি দিস মাচ ফেবার। আই অ্যাম নট ইন আ পজিশন টু টক। প্লিজ ওয়েট। প্লিজ।'

এ তো মহা মুশকিল হল। এমন করুণভাবে লিখছে, রণজয় কঠোর হতে পারছে না। কী-কে-কেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কৌতূহলও বেড়ে চলেছে। ছাড়তে পারছে না।

ফের মেসেজ পাঠাল, 'টেল মি দ্য একজ্যাক্ট টাইম।'

জবাব এল, 'অ্যাট টুয়েলভ মিডনাইট।'

ঠিক আছে। রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। দেখা যাক, কী গোপন কথা বলতে চায় ফোনের মালিক। উলটোসিধে বললে সোজা থানায় চলে যাবে রণজয়। আর ফোন না এলেও তাই।

আজ সকালের রুটিনটা ভেঙে গেল রণজয়ের। শুধু সকাল কেন, মনে হচ্ছে সারাদিনটাই বরবাদ হবে। কোনও কাজে মন বসাতে পারবে না। ইস্কুল যেতেও ইচ্ছে করছে না। উত্তেজনায় জ্বর-জ্বর লাগছে।

রণজয় বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল।

এখন রাত সাড়ে এগারোটা। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে রণজয়। মাঝে-মাঝে কবজি উলটে দেখছে।

সারাটা দিন ঘোরের মধ্যে কেটেছে। বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয়নি। বাবা ডাক্তার। সকাল-বিকেল বেরোবার আগে চেক আপ করে গেছেন। ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন, 'আজকের দিনটা রেস্ট নাও। মনে হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশান হয়েছে'।

খবর পেয়ে নির্মলদাও এসেছিলেন। ওকে খুব ভালোবাসেন। কিছুক্ষণ বসে গল্পগাছা করে গেছেন। রণজয় কাউকে কিছু বলতে পারে নি। লুকিয়ে রেখেছে মোবাইলটা। মাঝে একবার চার্জ দিয়েছিল শুধু।

বাবা-মা খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। ওদের এই হাউজিং কমপ্লেক্স এখন নিস্তব্ধ, সুনসান। কেবল বাইরের বড়-বড় হ্যালোজেন ল্যাম্পগুলো হলুদ চক্ষু মেলে আলো ছড়াচ্ছে।

রণজয়ের আলাদা ঘর। ওদের তিনজনের কাছেই ফ্ল্যাটের চাবি থাকে। প্রতিদিন কাকভোরে ও যখন বেরিয়ে যায় ছুটতে, তখন বাবা-মা ঘুমে অচেতন।

কবজি ওলটাল রণজয়। এগারোটা চল্লিশ। ছটফট করতে-করতে উঠে বসল। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জাগ থেকে জল খেল। ড্রইংরুমে এল। অন্ধকার। রিমোট দিয়ে মিউট করে টিভিটা চালিয়ে দিল। আলো বা শব্দ পেলেই বাবা-মা উঠে আসবেন।

পুট-পুট করে রিমোট টিপে একটা চ্যানেলে থামল। অ্যাডভেঞ্চার চ্যানেল। সমুদ্রে স্কি. স্কুবা ডাইভিং, প্যারাশুট-ডাইভিং, গ্লাইডিং দেখাচ্ছে। দারুণ লাগে রণজয়ের।

সোফার পাশে রেখেছে সেই মোবাইলটা।

অ্যাডভেঞ্চার দেখতে-দেখতে ডুবে গেছিল রণজয়। হঠাৎ বাঁ দিকে আলোর ঝলকানি।

মোবাইলের স্ক্রিন জ্বলছে-নিভছে! পাশের কোনও ফ্লাটের ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজছে।

কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি মোবাইল তুলে নিল। ইস, ভুলেই গেছে। সাইলেন্ট করে রেখেছিল ফোনটা। কিন্তু ফোনটা আসছে কোত্থেকে? কোনও নাম্বার ফুটছে না!

'হ্যালো।'

'রণজয় বলছ?'

বহু দূর থেকে ভেসে এল ফিনফিনে একটা গলা।

চমকে উঠল রণজয়। লোকটা এরমধ্যে ওর নাম জেনে ফেলেছে।

'অ্যাঁ-হ্যাঁ! আপনি?'

'আপনি না, তুমি বলো। আমি সিরাজ। চিনতে পারছ?'

'সিরাজ?'

'হ্যাঁ। চিনতে পারলে না তো? ছোটবেলা একসঙ্গে আমরা কিডিস কর্নারে পড়েছি। মনে পড়ছে?'

কিডিস কর্নার! নার্সারি স্কুল। সিরাজ? রণজয় মুহূর্তের মধ্যে পিছিয়ে গেল দশ-এগারো বছর। আকাশপাতাল স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। অনেক ছোট-ছোট মুখ। তার মধ্যে আবছা এক অবয়ব ভেসে উঠছে। ফরসা, রোগা, কোঁকড়া চুল। সে কী?

'ঠিক মনে করতে পারছি না। অনেকের মধ্যে...বলো সিরাজ, কী বলবে। কী করতে হবে আমাকে?'

'তেমন কিছু নয়, রণজয়। আমার মোবাইলটা, যেটা এখন তোমার কাছে, ফেরত চাই। আমি অন্তত এই ব্যাপারটায় লাকি, ওটা তোমার হাতে পড়েছে।'

'কোনও ব্যাপার নয়। চলে এসো। আমি বাইরে তোমার জন্যে ওয়েট করছি।'

'আসতে পারছি না ভাই। আটকে আছি। যেতে পারব না। তুমি সকাল থেকে আমার জন্যে এত ঝামেলা নিয়েছ। আরেকটু যদি করো। এসে দিয়ে যাও।...বিশ্বাস করো, আমার বেরোবার কোনও উপায় নেই। অথচ ওই মোবাইলটা আমার চাই। চাই-ই। ও আমার সর্বক্ষণের সাথী। ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।...একটু দিয়ে যাবে ভাই?

'কোথায়? কত দূরে? আচ্ছা সিরাজ, তুমি বেরোতে পারবে না কেন? তোমায় কি কেউ আটকে রেখেছে? কোনও ক্রিমিন্যাল-গুন্ডা?'

মোবাইলে একটা ক্ষীণ হাসি ভেসে এল। সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস।

'না ভাই। কেউ আটকায় নি। নিজেই আটকে গেছি। দূরে নয়।

তোমার বাড়ির কাছেই। হাঁটা-পথ। যদি এটুকু করো! আমি শান্তি পাই।'

রণজয়ের মাথায় হঠাৎ অন্যরকম ভাবনা ঝিলিক দিল। এ কোনও ফাঁদ নয় তো? এত রাতে, ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে কেউ বা কারা ওকে কিডন্যাপ করবে না তো?

দূ-র! ওর বাবা অতি সাধারণ ডাক্তার। তেমন কোনও পয়সাওলা নয়। এই হাউজিং-এর তিন কামরার ফ্ল্যাটে থাকে। বাবার একটা গাড়ি আছে। নিজেই ড্রাইভ করেন। কত টাকা পাবে ওকে আটকে রেখে!

সিরাজ বোধহয় পড়ে ফেলেছে ওর মনের কথা।

'না রণজয়। বিশ্বাস করো, আমি সত্যি বলছি। ওই মোবাইলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ওকে ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।'

রণজয় উঠে স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে ফেলল, নিজের মোবাইলটা অন করে বারমুডার পকেটে ভরল। চাবি দিয়ে গ্রিল গেট খুলে বেরিয়ে ফের বন্ধ করল।

'বলো। কী ভাবে যাব?'

'তোমাদের কমপ্লেক্সের পাশের রাস্তাটা ধরে সি. আই. টি. রোডে চলে এসো। ওপারে দমকলের অফিস। রাস্তা পার হও।...'

হনহন করে হাঁটছে রণজয়। কমপ্লেক্স-এর মেন গেট বন্ধ হয়ে গেছে। পাশের ছোট গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। নাহঃ, কেউ দেখতে পায়নি। এত রাতে একজনও জেগে নেই।

রাস্তায় দু-চারটে কুকুর শুয়ে ছিল। ওকে দেখে দু-চারজন ঘেউ-ঘেউ করল। ফের গুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

রণজয় হাঁটছে নিশি-পাওয়া মানুষের মতো। নিশুতি রাত। একটাও লোক নেই পথে।

বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে। দু-একটা গাড়ি সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তা পার হল রণজয়। মানিকতলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন। দমকলের লাল গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ফোন কানে দিল।

'থ্যাঙ্কিউ ভাই। এবারে উলটোডাঙার দিকে হাঁটো। নেকস্ট্ বাই লেন

ক্রস করে সামনে যে বড় ফটকটা দেখতে পাচ্ছ, ঢুকে পড়ো।...হ্যাঁ, ঢুকে যাও।'

রণজয় সম্মোহিতের মতো ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সামনে এক বিরাট প্রান্তর। এখানে-ওখানে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। আলো-আঁধারি। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ফোন ওর কানে।

'এবার বাঁ-দিকের পথ ধরে চলে এসো। ঠিক সামনের ডানদিকের পথ। সোজা চলে এসো। এসো...এসো।'

মাঝে-মাঝে দু-একটা ঝোপঝাড়, ফুলের গাছ। রণজয় হাঁটতে-হাঁটতে শেষপ্রান্তে চলে এল।

'ব্যস। সামনের বাঁ-দিকে তাকাও। কাঁচামাটির গুঁড়ো দেখতে পাচ্ছ? ওই অবধি চলে এসো।'

রণজয় রোবটের মতো পৌঁছে গেল।

'থ্যাঙ্কিউ ভাই। তোমার ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না। এবার ছোট একটা কাজ করবে?'

'ক্-কী?'

রণজয়ের গলা শুকিয়ে গেছে। স্বর বেরুচ্ছে না। কোনও অনুভূতি কাজ করছে না।

'তোমার সামনে যে উঁচু মাটির বেদিটা রয়েছে, যেখানে গুঁড়ো-গুঁড়ো ভিজে মাটি ছড়িয়ে আছে, ওর ওপর মোবাইলটা রেখে দাও। আমি পেয়ে যাব। প্লিজ।'

'মাটিতে রাখব! কেন? তুমি কোথায় সিরাজ? তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'আমি ওই মাটির নিচে শুয়ে আছি রণজয়। বেরোতে পারছি না।'

'মাটির নিচে! তুমি...তুমি...'

মুহূর্তে সংবিত ফিরে পেয়েছে রণজয়। ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে।

রণজয় দাঁড়িয়ে আছে এক কবরস্থানে। চারিদিকে সারি-সারি মৃত মানুষের কবর। বহুদূর বিস্তৃত। কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই।

হাত ঠকঠক করছে।... যেকোনও মুহূর্তে ওর কান থেকে ফোনটা পড়ে যাবে। ও জ্ঞান হারাবে।

'প্লিজ, প্লিজ, রণজয়! ভয় পেও না। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। আমার কথাটা একটু শোন।...আমি লিউকোমিয়ার পেশেন্ট ছিলাম। আমার বাবা-মা আমায় বাঁচাবার জন্যে লক্ষ-লক্ষ টাকা জলের মতো খরচ করেছেন। তাতে আমার চলে যাওয়াটা পিছিয়ে গেছে, আটকানো যায়নি। গতকাল সন্ধেয় মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলাম পার্কে। হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগতে শুরু করে। জ্ঞান হারালাম কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। সে জ্ঞান ফিরে আসেনি।

আজ সকাল ছ'টায় আমি টা-টা করে দিলাম। তুমি তো জান, আমাদের কবর হয়। সুন্দর পালকিতে করে আমায় নিয়ে এল এখানে। মাটি দিল। এখানেই শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমার সর্বক্ষণের সাথী মোবাইল? কেউ তাকে খুঁজে পেল না।

আমার ভাগ্য, তুমি আজ ওই বেঞ্চিটাতেই বসে ছিলে, যেখানে বসে ছিলাম আমি। আমার ভাগ্য, আর কারও চোখে পড়েনি ফোনটাকে। তাই তোমাকে দিয়েই আমি ফিরে পেয়েছি আমার বন্ধুকে।...তোমাকে আমি ভুলতে পারব না রণজয়।...প্লিজ, রণজয়, এবার ওকে ওই মাটির ওপরে রেখে দাও। তারপর নিশ্চিন্তে ফিরে যাও বাড়িতে। আমি আছি তোমার সঙ্গে।...'

রণজয়ের শরীর দিয়ে জলের মতো ঘাম ঝরছে। পা দুটো এখনও ঠকঠক করছে। ও অতিকষ্টে বলল, 'মোবাইল কি সুইচ অফ করব?'

'না ভাই। যতক্ষণ চার্জ থাকে, ও জীবন্ত থাকুক।'

কম্পমান রণজয় ঝুঁকে পড়ে আস্তে-আস্তে ঝুরো মাটির ওপর মোবাইল ফোন শুইয়ে দিল।

কয়েক সেকেন্ড! তারপর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। চোরাবালির অদৃশ্য টানে মোবাইল ফোনটা 'হু-স' করে ঢুকে গেল মাটির নীচে।

ঠিক তখনই রণজয়ের নিজের মোবাইলটা বাজতে শুরু করেছে। অবসন্ন হাতে পকেট থেকে বের করে বোতাম টিপল। ও জানে, এটা কার ফোন!

'রণজয়, তুমি বন্ধুর মতো কাজ করেছ। আমায় শান্তি দিয়েছ। খোদাতালা তোমার মঙ্গল করবেন। কোনও ভয় নেই। তুমি আস্তে-আস্তে ফিরে যাও বাড়িতে। কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। সামনের বছর ইন্টার স্টেট মিটে ম্যারাথন ইভেন্টে তুমি ফার্স্ট হবে। হব্‌বেই। গুড নাইট।'

রণজয় ফেরার পথে হাঁটতে শুরু করল। এখন আর ওর একটুও ভয় করছে না।

সেই রাতে

শেষরক্ষা আর হল না। প্রবলজোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

দিশেহারা হয়ে ছুটছিলাম। সামনে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। চশমার কাচ জলে ঝাপসা। তার উপর ঝোড়ো বৃষ্টিতে গলির টিমটিমে আলো আবছা হয়ে গেছে। গর্ত বা ইঁট পাথরের টুকরো পায়ে লাগলেই হোঁচট খেয়ে পড়ব যখন-তখন।

চতুর্দিক একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

আর থাকবেই বা কেন? একে রোববারের শীতের রাত, তায় অসময়ের ঝড়বাদল। কেউ এসময় ঘরের বাইরে থাকে? কাউকে কি পাগলা কুকুরে কামড়েছে!

আমাদের পাগলা কুকুর হচ্ছে 'ব্রিজ'। এ এমন এক যাচ্ছেতাই তাসের

নেশা, সারাক্ষণ চুম্বকের মতো টানে। খালি মনে হয়, এই আরেক ডিল খেলেই উঠে পড়ব।

এভাবে চলতে-চলতে ঘড়ির কাঁটা যখন এগারোটা ছুঁই ছুঁই, বাবলু বলে উঠেছিল,—কেমন ভিজে ভিজে বাতাস দিচ্ছে, বৃষ্টি হবে নাকি রে?

শুনেই আমার নেশা ছুটে গেছিল। তড়াক করে উঠে জানালায় উঁকি মেরে দেখি, সর্বনাশ! অন্ধকার আকাশ মেঘে মেঘে যে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে।

কোনওক্রমে হাতের ডিল শেষ করে বেরিয়ে পড়েছি। বাবলুর বাড়ি থেকে আমার মেস প্রায় মিনিট কুড়ির হাঁটাপথ।

হনহনিয়ে হাঁটছি, কবজি উলটোচ্ছি আর আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। পটলডাঙা স্ট্রিট পেরিয়ে সামনে কালীকান্ত ঘোষ লেন। বাঁয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট। কী করব? পারতপক্ষে এই গলিতে ঢুকি না। বেজায় সরু গলির মুখটা। তাছাড়া এমনিতেই বড্ড নির্জন। দুদিক পেল্লায় পেল্লায় সাবেকি আমলের বাড়ি। তার বেশির ভাগেরই দশা বেশ করুণ। দুয়েকটা তো একেবারে পোড়ো, ধ্বংসস্তূপের মতো। জানলা-দরজা-থাম ভাঙাচুরো, সর্বাঙ্গে আগাছা।

কিন্তু এই গলিটা ধরলে পথ অনেকখানি কমে যায়। আকাশের যা অবস্থা, তাতে,...যাক্‌গে যা থাকে কপালে। ঢুকে তো পড়ি! কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? গলির আদ্ধেকও পেরোই নি। আচমকা বাতাসের দম ছাড়ল। ব্যস, শোঁ-শোঁ করে ঝাঁপিয়ে এল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি।

ছুটতে-ছুটতে অন্ধের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। ওফ্, কী কনকনে বৃষ্টির ছাঁট, তীরের মতো বিঁধছে। একটা...একটা আশ্রয়—কোথায়? দুদিকের সব বাড়িগুলোর রোয়াক ঘেরা, একটারও গাড়িবারান্দা নেই।

ওই যে, ওই যে! কিছুটা আঁচ করে বাঁ-দিকের গাড়ি বারান্দায় লাফ মেরে উঠে পড়লাম। যাক্ মাথাটা অন্তত বাঁচুক।

লম্বা শ্বাস ছাড়লাম এতক্ষণে। পকেট থেকে রুমাল বের করলাম।

মাথাটা ভালো করে রগড়ানো দরকার। জ্বর আসবেই, তবু যতটা প্রিকশান নেওয়া যায়।

হি!-হি...হু!...হু...! কী ঠান্ডা! আমি একটা আস্ত রামছাগল! আর জীবনে কোনদিন এই তাসের চক্করে পড়ছি না। যা শিক্ষা হয়ে গেল, সারা জীবন মনে থাকবে।

ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি। সোয়েটার প্যান্ট সব ভিজে চুপচুপে।

কাঁপতে-কাঁপতেই এবার চারিদিকে তাকালাম। এ কী! এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? এ তো একটা ভগ্নস্তূপ বাড়ি। খন্ডহর ইটকাঠ দাঁত বার করে আছে, গাড়ি বারান্দার মাথার দিকে বট-অশ্বত্থের ডালপালা। পিছন ফিরলাম। ভাঙা জানালার খড়খড়ি নামানো। ভিতর থেকে একফোঁটা আলো আসছে না।

তার মানে, এটা পোড়া বাড়ি, পরিত্যক্ত! কোনও মানুষ থাকে না। ভাবতেই একটা বরফস্রোত নেমে গেল শরীর বেয়ে। আরও জোরে ঠকঠক করতে লাগল পা দুটো। এ কাঁপুনি শীতের নয়।

কি করব? নেমে আবার ছুটব? কিন্তু কীভাবে? যেভাবে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে চলেছে, মেসে পৌঁছতে-পৌঁছতে তো ঠান্ডাতেই জমে যাব। নিউমোনিয়া নির্ঘাত।

উরিব্বাস! হাওয়ার কী জোর। উলটোদিকের বাড়ির গায়ের হলদে স্ট্রিট বাল্‌বটা দুলছে হাওয়ার ধাক্কায়। বেঁকেচুরে যাচ্ছে বৃষ্টির স্রোত। কালীকান্ত ঘোষ লেনের এদিকটায় ওই একটাই আলো। ঝড়ে খুলে পড়বে না তো? তাহলে তো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার!

প্রাণপণে নিজেকে নিজে সাহস দিতে থাকি, ধ্যুৎ! কী আর হবে? এ তো আর গণ্ডগ্রাম নয়, খোদ কলকাতা।

আরে—ওটা কে? কে—? কে ওখানে? কোত্থেকে এল লোকটা? ঠিক আলোটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে? এই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে?

শুনছেন? ও মশাই?—চেঁচিয়ে উঠলাম।

অন্ধগলির মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর গমগম করে বেজে উঠল। কোনও জবাব নেই।

বুকের মধ্যে দমাদ্দম হাতুড়ি পিটছে, কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। লোকটার একমুখ দাড়িগোঁফ। চোখে কি চশমা আছে?

চিনু!

ধ্যাৎ! চিনু কোত্থেকে আসবে? চিনু তো গতমাসে—অ্যাঁ! আজকেই তো ষোলো তারিখ। গত ষোলো ডিসেম্বর—না, না! এ হতে পারে না। কী আবোল তাবোল ভাবছি?

—ও ম-শাই, শু-শুনছেন?

নিজেই বুঝলাম, গলাটা কেঁপে গেল।

—ঠিক দেখছি তো? চোখের ভুল নয়তো? চোখ যথাসম্ভব সরু করে একটু ঝুঁকে তাকালাম উলটোদিকের বাড়ির গায়ে।

এইসময় আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ক্ষণিকের চোখধাঁধানো আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

পরক্ষণেই আবার অন্ধকার, টিমটিমে আলোছায়া। হ্যাঁ, আমার চোখেরই ভুল। ওই তো মনে হচ্ছে, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আসলে আলোর নিচে বাড়িটারই ছায়া পড়ছে।

ওঃ! বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

রুমালে মুখ মুছে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। উপায় নেই, অপেক্ষা করতে হবে। দুর্যোগ একটু কমলে রাস্তায় নামব।

সত্যি মানুষ কত সহজে ভয় পেয়ে যায়! আমিও তো একটু হলে চিনু ভেবে...আচ্ছা, চিনু আত্মহত্যা করল কেন?

মুহূর্তে চিনুর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

চিনু—চিন্ময়। আমাদের ছোটবেলার প্রাণের বন্ধু। একসঙ্গে স্কুল কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। হঠাৎ গতমাসের এই আজকের তারিখে নিজেই নিজেকে দাঁড়ি টেনে দিল। ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। গ্লাসের তলায় ওর হাতে লেখা কাগজ চাপা ছিল, 'আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী'।

অন্যজাতের ছেলে ছিল চিনু। মনটা ছিল ওর জলের মতো স্বচ্ছ, আকাশের মতো উদার। বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমাদের তাপস চাকরি পাচ্ছে না কলকাতায়। চিনু নিজের মাস্টারির চাকরিতে

ঢুকিয়ে দিল ওকে। বাবলুর বাবা হঠাৎ ক্যান্সারে মারা গেলেন, চিনু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে বাবলুকে আগলাতে লাগল। হাসপাতাল শ্মশান, সব দায়িত্ব চিনুর।

নিজের কথাই বা ভুলি কী করে? বি.এসসি পার্ট টু পরীক্ষার আগে হঠাৎ একদিন মাথা ঘুরে গেল প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। ডাক্তার এলেন তখনই। বললেন, প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি। ভালোমন্দ খেতে হবে, প্রচুর দামি ওষুধ খেতে হবে।

ডাক্তার তো বলে খালাস, ওসব জুটবে কোত্থেকে? আমি গাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে, জমিজিরেত কিচ্ছু নেই। দাদার একার চাকরিতে দেশের সংসার চলে, কলকাতায় আমার লেখাপড়া চলে। এতসব লম্বা ফিরিস্তি কেনার টাকা কই দাদার?

চিনু এসব ভাবার সুযোগই দিল না। সিধে বাবলু তাপসকে সাথে নিয়ে আমার মেসে চলে এল। এসেই হুকুম, নে, জামাকাপড় গুছিয়ে নে।

—কোথায় যাব?

—আমার বাড়ি। মাকে বলে এসেছি। ওখান থেকেই তুই পরীক্ষা দিবি। কী, হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন? চল্ চল্।

—না চিনু, এ হয় না। তোর বাড়িতে আমি হঠাৎ, অন্যরা আছেন, না, না...ছেড়ে দে ভাই। তোরা কিছু ভাবিস না, আমি ঠিক হয়ে যাব। দাদা অফিস থেকে ফিরুন, আমি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখাচ্ছি।

—ফালতু বাত ছোড়! যাবি কি না বল্? চিন্ময় নন্দী ফিরে যাবার জন্যে আসে নি। যদি তুই আমাদের সঙ্গে না যাস, জেনে রাখ আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই শেষ।

আপাদমস্তক একরোখা গোঁয়ার ছিল ছেলেটা। তাই ওর আদেশ অমান্য করার সাহস হয়নি। পরীক্ষার তখন আর পনেরো দিন বাকি। ওই কটা দিন চিনুর বাড়িতে জামাই-আদরে প্রচুর ভালোমন্দ খেয়ে আর চুটিয়ে পড়াশুনো করে পরীক্ষা দিতে যখন গেলাম, নিজেই দেখি নিজের জামাপ্যান্ট একেবারে টাইট হয়ে বসেছে। অবশ্য যে কদিন চিনুর বাড়ি ছিলাম, তাপস বাবলুও রোজ আসত। ফল, হরলিক্স, ওষুধ-পথ্য নিয়ে।

এরকমই আশ্চর্য অদ্ভুত ছিল আমাদের চারজনের বন্ধুত্ব। আমরা

নিজেরা নাম দিয়েছিলাম 'ফোর স্কোয়ার'। সেই ফোরের আসল স্কোয়ারটাই যে আচমকা একদিন খসে যাবে, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

চোখদুটো কখন যে ঝাপসা হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারি নি। হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার তাকালাম সামনের দিকে। আজ রাতের এই দুর্যোগ কি থামবে না? অবিশ্রান্ত জল তো ঝরেই চলেছে।

চিনু, তুই সুইসাইড করলি কেন রে? আমরা তো ঠিক করেছিলাম, কেউ কোনও কথা নিজেদের মধ্যে লুকোব না। তুই, তুই সেই চুক্তিভঙ্গ করলি।

তুই জানিস না আমার মৃত্যুর কারণ? এখন শুনতে চাস?

হঠাৎ মগজের মধ্যে বেজে উঠল চিনুর গলা। কনকনে একটা বাতাস বয়ে গেল। শিউরে উঠলাম।

আমি দাঁড়িয়ে আছি পুরোনো উত্তর কলকাতার সরু গলির এক পোড়ো বাড়ির গাড়ি বারান্দায়। হয়ে চলেছে বজ্রবৃষ্টি, বয়ে চলেছে নিস্তব্ধ গভীর রাত। আমি একা, একেবারে একা।

না না, জানার কোনও দরকার নেই। আর জেনে হবেটা কী? চিনু তো আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু দরকার নেই বললেও, চিনুর কথাটা মন থেকে যাচ্ছে কই? বারবার যে ফিরে ফিরে আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে বুকের ভিতর। সত্যিই কি আমরা জানি না চিনুর আত্মহত্যার কারণ? আমরা কি নিজেরাও দায়ী নই?

না—না, আমরা দায়ী হব কেন? আমরা কী করেছি?

সত্যি, কিছুই করিনি। বন্ধু হিসেবে আমাদের কি করণীয় কিছু ছিল না? চিনুর কাছ থেকে শুধুই নিয়ে গেলাম দু-হাত পেতে?

কেন, আমরা তো ওকে চেপে ধরেছিলাম! ও তো নিজে থেকে কখনও কিছু বলেনি। তবু কিছুদিন যাবত ওর চনমনে চেহারায় পরিবর্তন দেখে আমরা তিনজনে ওকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি। 'কী হয়েছে তোর?' ও বলেছে, সব ঠিক আছে। সত্যি সূর্যের মতো, একদিন ঠিক প্রকাশ পাবে।

ব্যস, এইটুকু! এইটুকুতেই আমাদের সব দায়িত্ব শেষ? আমরা তো

জানতাম, চিন্ময় অসম্ভব ইমোশন্যাল, একগুঁয়ে। জানতাম ওর বাড়ির সমস্যা। ওর বাবা কাস্টমসের পদস্থ অফিসার। দুহাতে উপরি টাকা নেন। ছেলেবেলা থেকে চিন্ময় ছিল একেবারে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। সৎ আদর্শবাদী। তাই একটু বড় হবার পর থেকেই বাবার সঙ্গে ওর বিরোধ বাড়তে থাকে। তারপর পাস-টাস করে আমরা যখন যে যার মতো কাজে ঢুকে পড়লাম, চিনু সোজাসুজি বাবাকে একদিন চার্জ করল, বাবা তুমি এটা অন্যায় করছো। তোমার বিবেককে তুমি কী জবাব দেবে? তোমার ছেলেমেয়েরা কি শিখছে?

বাবা তো ছেলের স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত। শুনেছি রাগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন নি। তারপরে হিসহিসে গলায় বলেছেন, অতই যদি তোমার নীতি-আদর্শ, তো বাপের হোটেলে দোবেলা গিলছ কেন? লজ্জা করে না তোমার?

ঠিক সেই দিন, আধঘণ্টার মধ্যে চিনু বাড়ি ছেড়েছিল। তল্পিতল্পা নিয়ে গিয়ে উঠেছিল হেদুয়ার বসন্ত কেবিনের পাশে একটা মেসে। সেখানে ছিল মাসদুয়েক। তারপর গত ১৬ ডিসেম্বর ওর ঘরের বন্ধ দরজা আর খোলে নি।

চিনু তো আমাদের বাড়ি ছাড়ার কারণ জানিয়েছিল। তবু কি আমরা সেইভাবে এগিয়ে এসেছিলাম? আমার অসুস্থতায় যে বুকে করে নিয়ে গেছিল নিজের বাড়িতে, তাকে কি একবারও বলেছিলাম, চল্ চিনু আমার মেসে চল্? বরং জ্ঞান দিয়েছিলাম, তোর এত জেদ ভালো নয়।

তাপসকে নিজের চাকরিটা দিয়ে দেবার পর চিনু বরং ছিল খানিকটা বেকার। ছবি তুলে টুকটাক আয় করত। বাবলু রিসার্চ করছিল। মাস গেলে ভালো স্টাইপেন্ড। আমি ব্যাঙ্কে ঢুকে গেছিলাম।

তবু আমরা...উঃ! এত স্বার্থপর হয়ে গেছি এর মধ্যে। বুকটা পুড়ে যাচ্ছে অনুশোচনায়।

চিনু—চিনু, তুই আমায় ক্ষমা কর। আমরা তোর বন্ধুত্বের সম্মান দিতে পারি নি। আমরাই তোর মৃত্যুর জন্য দায়ী রে।

—যাক, তবু স্বীকার করলি।

কে—? কে বলল কথাটা? আমার শরীরটা কেঁপে উঠল থরথর

করে। সামনের স্ট্রিট-ল্যাম্পটা আবার দুলে উঠল হাওয়ার ধাক্কায়। টিমটিমে হলদে আলোটা কাঁপছে।

কোত্থাও কেউ নেই। একটা কুকুরও ডাকছে না।

না—না, ধ্যুৎ! কথাটা কেউ বলে নি বাইরে থেকে। তবে কে বলল? আমার বিবেক?

বৃষ্টি কমে যাচ্ছে। হঠাৎ হু-হু করে বাতাস ছাড়তে শুরু করল। গলির কোণের আবর্জনার স্তূপ থেকে ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে উঠল পাতাপুতি, জঞ্জাল।

আমার গায়ে উড়ে এসে পড়ল কিছুটা। ইস্-স্, কী পচা গন্ধ!

ডানহাত দিয়ে তাড়াতাড়ি নোংরা ঝাড়তে লাগলাম। কয়েকটা কাগজের টুকরোও আছে। জামার কলারের গায়ে একটা বড় টুকরো লেগেছিল। ঝাড়তে গিয়ে হাতে লেপ্টে গেল।

বাঁ-হাত দিয়ে সেটাকে ফেলতে গিয়ে চমকে উঠলাম।

এ কার হাতের লেখা?

কাগজটায় লেখা আছে 'ভালো আছিস?'

'ভ'-এর অর্ধেক আর জিজ্ঞাসার চিহ্নটা নেই, ছিঁড়ে গেছে!

আমার কান মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে! আমি কি অজ্ঞান হয়ে যাব?

অবিকল চিনুর হাতের লেখা।

তবে কি চিনু...মানে অশরীরী চিনু এখানে এসে গেছে? লাফ দিয়ে নেমে দৌড় দেব? শরীর অবশ, পা দুটো পাথর।

চিনু কি এবার সামনে এসে দাঁড়াবে? কী বলবে? কী শাস্তি দেবে? গলা টিপে ধরবে?

না-না, তাই কি চিনু কখনও পারে? আমাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত যে। তাছাড়া...তাছাড়া এই আলোর মধ্যে ও আসবেই বা কী করে? শুনেছি ওরা নাকি আলোয় আসতে পারে না।

যদি এখনই সব আলো নিভে যায়?

দপ্! স্ট্রিট বালব্টা ফেটে গেল।

গোটা দুনিয়া অন্ধকার।

নিশ্ছিদ্র আঁধার! আমার দু-চোখ অন্ধ।

তবু চেষ্টা করতেই হবে...প্রাণটা এসে গেছে গলার কাছে...আমায় বাঁচতেই হবে...লাইটার, আমার লাইটারটা কোথায় গেল? বুকপকেটেই তো ছিল...ফেলে এলাম?...

আচমকা পিছন থেকে ভেসে এল অমানুষিক এক গোঙানি,—ও ম্যা-গোঁ-আঁ-ও আঁ-মাঁ-য়ঁ ছেঁ-এঁ-ড়েঁ...

আর পারলাম না।

আমার চোখের সামনে থেকে পৃথিবী মুছে গেল।

জলের শীতল স্পর্শ। এক গভীর সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসছি। আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে আসছে। আস্তে আস্তে চোখ মেললাম।

ভাঙাচোরা কড়ি বরগা, আবছা কাঁপা-কাঁপা আলো। দুটো ছায়াছায়া মুখ আমার উপর ঝুঁকে আছে।

এরা কারা? আমি কি পরপারে এসে গেছি? আবার চোখ বুঁজে ফেললাম।

এক অচেনা মহিলাকণ্ঠ, এই যে, শুনছেন? প্লিজ চোখ মেলে তাকান।

পাশের পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, নির্ঘাত ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

একটু-একটু করে সাহস ফিরে আসছে। অস্ফুটে বললাম, আ...আমি কোথায়? ও-ওই গ্-গলার আ-আওয়াজ?

আপনি আমাদের বাড়ির বাইরে অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন।—পুরুষকণ্ঠ বলল, আমার স্ত্রীকে ঘুমের ভিতর বোবায় ধরেছিল। আপনি বোধহয় সেই শুনেই, সত্যি শ্রীলা, তোমার এই বদভ্যেসটা আর কিছুতেই গেল না। শেষে মানুষ খুনের দায়ে একদিন আমায় জেলে যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসেছি। ভদ্রলোকের স্ত্রী লজ্জিত গলায় বললেন, —কী করবো, বলো? কত ডাক্তার দেখালাম, কেউ সারাতে পারল না।

হাতের ইশারায় বললাম, জল।

এর পরের ঘটনা সাদামাঠা। বাইরে বৃষ্টি ধরে এসেছিল। তবু আমাকে ওঁরা, মানে ঐ বাড়ির স্বামী-স্ত্রী কিছুতেই বেরোতে দিলেন না। রাত তখন দেড়টা। কারেন্ট তখনও ফেরে নি। অন্ধকারে ডুবে আছে গোটা তল্লাট।

বাকি রাতটুকু গল্প করে কেটে গেল। ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়েছি। হঠাৎ কি খেয়াল হতে ডানহাতের মুঠোটা খুলে ফেলেছি।

কী আশ্চর্য! ছেঁড়া কাগজের টুকরোটা এখনও লেপ্টে আছে আমার হাতের তালুতে।

লেখাটা স্পষ্ট! 'ভালো আছিস?'
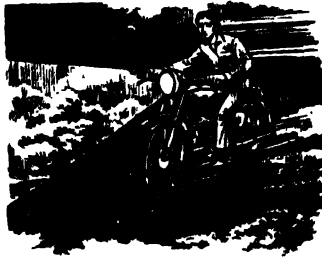
কেমন আছেন গজেনবাবু?

—নমস্কার গজেনবাবু! কেমন আছেন?

—আরে রমেশ! বোসো, বোসো। ভালো আছি ভাই। তুমি কেমন আছ? কতদিন পরে দেখা।

—'দিন' না বলে, 'কাল' বলুন দাদা।

—কেন হে, কাল কেন হবে? এই তো...লেকে মর্নিংওয়াক করছিলুম। তুমি দেখতে পেয়ে গাড়ি থামালে। খোঁজখবর নিলে। কতদিন আগে? বড়জোর মাসছয়েক হবে।

—ছমাস কম হল দাদা? চব্বিশ ঘণ্টা ইনটু ষাট মিনিট ইনটু ষাট সেকেন্ড। তাকে গুণ করুন একশো আশি দিয়ে। মোট কত সেকেন্ড হল? পনেরো লক্ষ পাঁচশো বাহান্ন হাজার। আর এসব ম্লেচ্ছ হিসেব ছেড়ে যদি

কিনা বিশুদ্ধ দিশি হিসেব কষেন, অর্থাৎ দিবা-রাত্রি দণ্ড-প্রহর পল-অনুপল—

—ওরে ব্বাপ, থামো, থামো! আমার ঘাট হয়েছে ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় আর পারা গেল না।

—সে তো দাদা আপনার কাছেই শিখেছি। আপনি এত সুন্দর বলেন, এত সুন্দর লেখেন।

—আহা, থাক-থাক, আবার ওসব কেন? কী ব্যাপার বলো। হঠাৎ এত রাতে?

—কিছুই না, এমনি। ফাঁকা পেলুম। ইচ্ছে হল, চলে এলুম। রাত আর এমনকী হয়েছে! সবে দশটা। আমি তো জানি, এই সময় আপনি বাড়ি থাকবেনই। সারাটা দিন আপনার কোথাও-না-কোথাও সভাসমিতি, উদ্বোধন—

—যা বলেছ ভাই! আর পারা যাচ্ছে না। সকলেই আমায় নিয়ে টানাটানি করে। কোনদিকে যে যাই!

—কী করবেন বলুন? একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। আপনি ছাড়া আর আছেটা কে? কী করছেন? লিখছেন?

—লিখছেন বোলো না, বলো 'ঘষছেন'। কাগজের ওপর কলম দিয়ে ঘষেই চলেছি। সারাবচ্ছর লেখার তাগাদা। পরশু একটা উপন্যাস শেষ করেছি। সঙ্গে-সঙ্গে আরেক পত্রিকার অনুরোধ 'একটা গল্প। পৌষালি সংখ্যার জন্যে'। আমার হয়েছে মুশকিল। কাউকেই ফেরাতে পারি না। বুঝলে রমেশ, পুরো মেশিন হয়ে গেছি। গরুও বলতে পার। খড় গুঁজে দিচ্ছে, দুধ দাও। নোট নাও, লেখা দাও।

—হাঃ! দারুণ বলেছেন দাদা।...আপনার মাথায় এত আইডিয়া আসে কী করে? কোত্থেকে পান?

—নারে ভাই, এখন আর আইডিয়ার জন্যে ওয়েট করি না। যা মনে হল, শুরু করে দিই। শেষ অব্দি কোথাও-না-কোথাও গিয়ে পৌঁছোয়।

—হ্যাঁ। আপনার ভাষাটা এত ঝরঝরে, যা-ই লিখুন, পাঠককে পড়িয়ে ছাড়েন। তবে এখনকার লেখাগুলোয় মালমশলা বিশেষ নেই। আইডিয়া আসত ভবেশের মাথায়। ভালোই লিখছিল, বলুন!

—ভবেশ মানে তোমার জুড়ুয়া ভাই? অবশ্যই। ভেরি পাওয়ারফুল পেন।

—আপনি খুব স্নেহও করতেন।

—নিশ্চয়ই। করার মতনই ছেলে। আরে ভাই, আমরা আর কতদিন লিখব? মেরেকেটে দশ বছর। এর মধ্যে নেক্সট জেনারেশন রাইটার তৈরি না হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, ভাবতে পার? এখন নতুন যারা লিখছে, শুনি, তাদের বইয়ের তেমন কাটতি নেই। পাঠকরা নিচ্ছে না। কী ভয়ের কথা ভাবো!

—সেটা কি আপনারা সত্যি-সত্যি বুঝছেন দাদা?

—কী বলছ, রমেশ? আর কেউ না বুঝুক, আমি যে সবসময় তরুণদের প্রোমোট করি, সেটা দেখছ না? সব সভা-সেমিনার-উদ্বোধনে উদ্যোক্তারা আমায় ডাকলে আমি অন্তত দু-তিনজন ইয়াং কবি-লেখককে সঙ্গে রাখি। আমার ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

—হ্যাঁ, সেটা অবশ্য করেন। মানতে হবে।

—তবে? এই যে তোমার ভাই ভবেশ, ওকে নিয়ে কম জায়গায় ঘুরেছি? পত্রিকার সম্পাদকের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি, পাবলিশারকে ফোন করেছি। এমনকী টেলি-সিরিয়ালের ডইরেকটরদেরও রিকোয়েস্ট করেছি, ওর গল্প নিয়ে ছবি বানাতে। ছেলেটার মধ্যে সত্যি বড় সম্ভাবনা ছিল।

—তারপর হঠাৎ একদিন সে ফট্ হয়ে গেল। কেন বলুন তো গজেনবাবু?

—কী জানি ভাই? তোমরাই বলতে পারবে ভিতরের কথা। তোমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার। কী যে দুঃখ পুষে রেখেছিল মনের ভিতর, জানতেও পারলাম না।

—ফ্যামিলিতে কিন্তু কোনও সমস্যা ছিল না। সমস্যা সবটাই ওর নিজের। ঠিকভাবে বলতে গেলে ওর ব্যাপারটা ঠিক সুইসাইড নয়, খুন।

—খুন?

—হ্যাঁ, দাদা। ও নিজেকে নিজে খুন করেছিল। ওর মধ্যে তখন হতাশা, রাগ, দুঃখ ছাড়া কিচ্ছু নেই। কাউকে বলতে পারছে না। নিজেকে

নিজে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে ও মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

—আশ্চর্য! কী এত দুঃখ, রাগ? এই বয়েসে?

—দাদা, আপনি নিজেও সাহিত্যিক। জানেনই তো লেখকরা কীরকম ইমোশন্যাল হয়। লেখকের নিজের সৃষ্টি, আইডিয়া যদি বেহাত হয়ে যায়, সে যদি দেখে তার মালমশলা চুরি করে অন্য লেখক দিব্যি লেখা বানাচ্ছেন এবং খ্যাতির চুড়োয় উঠে যাচ্ছেন, তখন তার কী অবস্থা হয় বলুন? সহ্য করতে পারে?

—সে কী! বলো কী রমেশ? ভবেশের লেখা বেহাত হয়ে গেছিল? ওর লেখা অন্য লোকে নিজের বলে চালিয়েছে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! সেই জঘন্য নোংরা লেখকটি কে? তুমি বলো, আমি নিজে—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান! অত উত্তেজিত হবেন না। এখন উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভও নেই। ভবেশ আর ফিরে আসবে না।

—তাতে কী হয়েছে? এই ইতরামির প্রতিবাদ হবে না? এসব কথা তুমি আগে বলোনি কেন? আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে সেই তস্করের মুখোশ টেনে খুলে দিতাম।

—ঠিকই বলেছেন। আরও আগেই আমার আসা উচিত ছিল। আর কাউকে না হোক, আপনাকে বলা বিশেষ দরকার ছিল। আমার সমস্যা হচ্ছে, এমন জায়গায় থাকি, হুটহাট চলে আসা যায় না। আজ একটু ফাঁক পেলুম, চলে এলুম।

—বেশ করেছ। বেটার লেট দ্যান নেভার। এবার বলো দিকি সবটা।

—গজেনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ভবেশের একটা জাবদা খাতা ছিল? লেখার খাতা? যখন যা মনে আসত, দেখত-শুনত, ওই খাতায় পয়েন্টগুলো টুকে রাখত। সময়-সুযোগমতো পয়েন্টগুলো থেকে গল্প বা উপন্যাস খাড়া করত।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। অমন একটা খাতা দেখেছি বটে।

—দেখবেনই তো। ভবেশ যেখানেই যাক, খাতাটা ওর কাঁধের ঝোলাব্যাগে সবসময় থাকত। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে ও শেষ গেছিল বালেশ্বরে। অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সে। গত বছর তিরিশে ডিসেম্বর। ন্যাশনাল আকাদেমি সারা ভারত থেকে প্রায় একশো কবি-

সাহিত্যিককে ইনভাইট করেছিল। মনে পড়েছে আপনার?

—আমিও বোধহয় ছিলাম ওই সম্মেলনে।

—নিশ্চয়ই দাদা। আপনাকে বাদ দিয়ে এখন দেশে কোনও সভা-সম্মেলন হয় নাকি? হওয়া সম্ভব? আপনি শুধু গেছিলেন না, সম্মেলনের শেষদিনে চাঁদিপুর সি-ভিউ রিসর্টে ভবেশ আর আপনি একই ঘরে রাত কাটিয়েছিলেন।

—ঠিক, ঠিক। এবার মনে পড়েছে। তোমার মেমারি দেখছি খুব শার্প।

—যা বলেছেন! ভুলে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। সব একেবারে ছবির মতো পরিষ্কার। চাঁদিপুর থেকে কলকাতা ফেরার দিন সকালে ভবেশ হতভম্ব। ওর লেখার খাতাটা কোথাও নেই! ভ্যানিশ! ব্যাগ-ব্যাগেজ তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু খাতার কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

—আশ্চর্য! ও আমায় কিচ্ছুটি বলেনি। একবার যদি মুখ ফুটে বলত, আমি তখনই লোকলস্কর লাগিয়ে—

—এক মিনিট! আপনাকে বলার ও সুযোগ পেল কোথায়? আপনি ওইদিনই অনেক ভোরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ওখান থেকে সরাসরি জব্বলপুরে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে আপনার প্রোগ্রাম ছিল। আপনি যখন গাড়িতে চেপে জব্বলপুর রওনা হয়ে গেছেন, তখন বেচারি ভবেশ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঠিক কিনা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এটাও তুমি ঠিক বলছ। ভবেশ তাহলে তোমায় সব বলেছে!

—বলতে হয়নি গজেনবাবু, সব জেনে গেছি। আমি এটাও জানি, খাতাটা এখন কোথায়।

—জানো? বাঃ! তাহলে আর দেরি করছ কেন? চল, আমরা দুজনে এখনই গিয়ে ভবেশের স্মৃতি—

—কোথাওই যেতে হবে না গজেনবাবু। চুপ করে বসুন! আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। হ্যাঁ, বসে থাকুন। একটুও নড়বেন না।

—মানে? এ কী! তুমি এই ভাষায় কথা বলছ আমার সঙ্গে?

—এখন তো শুধু বলছি, আর কিছু করিনি।

—ওয়াট? কী বলতে চাইছ? তুমি...তুমি কিন্তু লিমিট...

—শাট্ আপ! চুপচাপ যা বলছি করুন। আপনার ডানদিকের দেয়াল-আলমারির দ্বিতীয় তাক থেকে ভবেশের লেখার খাতাটা বের করে আনুন।

—খাতা! আমার কাছে? তুমি কি পাগল?

—পাগল? তাই মনে হচ্ছে আমায়? বুঝতে পারছেন না, আমি তৈরি হয়ে এসেছি?

—তৈ-রি!...কে...কে...তুমি...?

—আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ...আমি...হাঃ-হাঃ! আমাকে চিনতে পারেননি এখনও?...চোখে কি ন্যাবা হল গজেনবাবু?

—তুমি...? তুমি?...না-না, তুমি তো রমেশ! খবরদার রমেশ! আমায় উত্যক্ত কোরো না।...গেট আউট! এখনই বেরিয়ে যাও।

—যদি না বেরোই?

—এখনই...এখনই চিৎকার করব। সমস্ত লোকজন ছুটে আসবে। তারপর তোমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে—

—কেউ আসবে না! আপনার ঘড়ি বন্ধ। এখন রাত একটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভালো বলেছেন...হাঃ-হাঃ-হাঃ...আমি রমেশ! এই চিনলেন আমায়?

—ঠ্-ঠিকই চ্-চিনেছি। বাজে ভয় দেখাচ্ছ। নচ্ছার কোথাকার! ওই তো তোমার বাঁ-গালে জড়ুল। ভবেশের কোনওকালে গালে জড়ুল ছিল?

—ছিল না, না? এ-হে, তাড়াহুড়োতে বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আসলে আজকাল পুরোনো চেহারাটা বড্ড ভুলে যাই যে! এবার ভালো করে দেখুন তো! চিনতে পারছেন গজেনবাবু?

—এক্-কী! ত্-ত্-তুমি...ভ্-ভব্-এ-এ-আঁ-আঁ-আঁঃ!

সব দৈনিক সংবাদপত্রেরই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল।

'একালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যেক শ্রীগজেন্দ্রকুমার ঘোষ পরশু গভীর রাতে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সকালে তাঁর প্রাণহীন মরদেহ কাজের ঘরে লেখার চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। টেবিলে পাওয়া গেছে প্রচুর কাগজ ও পোড়া ছাই। সম্ভবত সাহিত্যিকের কোনও অর্ধসমাপ্ত লেখার পাণ্ডুলিপি। আশ্চর্যের বিষয়, টেবিলের অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন জলের গ্লাস, পেনস্ট্যান্ড ও কলম, পেপারওয়েট এমনকী লেখার সাদা কাগজ সবই সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। রহস্যের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ছাইয়ের সঙ্গে গজেন্দ্রকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ঠিক ৭০ বছর। কারণ, পরশু ছিল গজেন্দ্রপ্রসাদের সত্তরতম জন্মদিন।'

আর সময় নেই

বাব্বা! আপনি এখনও জেগে আছেন?

চমকে ফিরে তাকালাম। আঙুল থেকে সিগারেটটা পড়েই যাচ্ছিল। একজন সম্পূর্ণ অচেনা যুবক। দুই কম্পার্টমেন্টের মধ্যের করিডরে টয়লেটের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে ওদিক থেকে এসেছে, খেয়াল করিনি।

খেয়াল করার কথাও নয়। এয়ার কন্ডিশনড কামরায় ধূমপান নিষিদ্ধ। তাই স্যুইংডোর পেরিয়ে এই প্যাসেজের সরু বাঙ্কে বসে সিগারেট ধরিয়েছি। দরজার কালো কাচের ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম চলমান অন্ধকারের দিকে। গাঢ় কালোর মাঝে সরে-সরে যাচ্ছে হলুদ আলোর

ঝলকানি। ঠিক যেন ব্রাশের টান। এত স্পিডে কেউ তুলির টান দিতে পারবে?

যুবকটি একগাল হাসি নিয়ে চেয়ে আছে। যেন আমার কতকালের চেনা! করিডরের টিউবলাইটের সাদা আলো ওর মুখে-চোখে। ভালো পোর্ট্রেট হতে পারে।

কিন্তু এখন আমার বেশ বিরক্তি হচ্ছে। চিনি না, জানি না, কোত্থেকে এই উটকো আপদ এসে জুটল! আমি ঘুমোই না জেগে থাকি, তোর কী!

কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েই যেত। তার আগেই যুবকটি খুব আন্তরিক গলায় বলে উঠল,—আপনি আমায় চিনবেন না সুগতদা। আমি আপনার ছবির ভক্ত। আপনার ছবির একজিবিশন দেখতে আমি গত মাসে মালদা থেকে কলকাতা গেছিলাম। বিশ্বাস করুন, আপনার ছবি দেখার পর থেকে কয়েকদিন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম। ওই যে...চুল শুকোচ্ছে বাড়ির মেয়ে, বাঁশি বাজাচ্ছে গোধূলি আলোয়...এখনও ভাবলে আমার বিশ্বাস হয় না। তারপর ধরুন রাজস্থানী ডান্স...ইনসেন ওল্ড ম্যান...কী করে এমন আঁকেন সুগতদা? আমি যে ভাবতেই পারি না।

বিরক্তি মুছে যাচ্ছিল। এই মধ্যরাতে ঘুমন্ত ট্রেনের কামরায় আমার এতবড় ভক্ত পেয়ে যাব, সে নিজে চলে এসেছে আলাপ করতে...আমার কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে।

একটু হেসে বললাম,—তুমি দেখছি আমার ছবি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছ। অত ভালো আমি আঁকি না, ভাবিও না।...কোথায় দেখেছ আমার ছবি?

—কলকাতায়, অ্যাকাডেমিতে। গত মাসে। আপনার সোলো একজিবিশন চলছিল। কাগজে পড়ে ছুটে গেছিলাম। ওখানেই আপনাকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি।

—তাই? তখন আলাপ করলে না কেন?

যুবকের মুখে লজ্জার আভা ফুটল। বলল,—খুব ইচ্ছে হয়েছিল।... আসলে তখন মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, ঘুরে-ঘুরে আপনার পেন্টিং দেখছিলেন, আপনি সঙ্গে ছিলেন...আমি এগোতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছি।

—তুমি কী করে জানলে আমি এই ট্রেনে আছি?

—মালদা স্টেশনেই দেখেছি। অনেকে এসেছিল আপনাকে তুলে দিতে। মন্ত্রী, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। আপনার এখানে কোনও প্রোগ্রাম ছিল সুগতদা?

—হ্যাঁ ভাই। তোমাদের আর্ট গ্যালারিতে আজ থেকে একটা ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছে। সেজন্যেই কর্তারা আমায় ডেকে এনেছিলেন।

ও...।—যুবক নিজের মনেই বিড়বিড় করল, জানতে পারিনি।...কবে এসেছেন?

—আজই ভোরে। গৌড়ে।...আরে! তোমার নামটাই জানা হয়নি।

—অশেষ। অশেষ জানা।

—কী করো? মানে চাকরি-বাকরি কিছু...

—হ্যাঁ। এখানকার জেলা স্কুলে বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখাই। ড্রইং টিচার।

—তুমি আর্টিস্ট? তাই বলো! এত খুঁটিয়ে আমার ছবি স্টাডি করেছ, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল!

না-না সুগতদা, কী যে বলেন!—অশেষ সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেল। থেমে-থেমে বলল,—আর্টিস্ট আর হতে পারলাম কই! স্বপ্নই শুধু দেখে গেলাম, শিল্পী হওয়া আর হল না। সারাদিন শুধু স্টুডেন্টদের কলা-মুলো-গাছ কিংবা গ্রামের ছবি, বৃষ্টির দৃশ্য এইসব আঁকাচ্ছি। বছরের পর বছর। উঃ! মাঝে-মাঝে এমন অসহ্য লাগে।

আমার মন সমব্যথায় ভরে গেল। এই মিনিট দশেকের আলাপেই অশেষ আমার কাছের মানুষ হয়ে উঠছে। সান্ত্বনার সুরে বললাম, —তুমি এত ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছ কেন? কীই বা এমন বয়েস তোমার? ছাব্বিশ, সাতাশ?

—না, ত্রিশ পেরিয়েছি।

—কিছুই নয়। পৃথিবীর প্রায় সব প্রণম্য শিল্পীরাই খ্যাতি পেয়েছেন পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়ার পর। অশেষ, তুমি ছবি নিয়ে এত ভাবো, এত স্টাডি করো, নিজে পেন্টিং শুরু করো। যা ইচ্ছে আঁকো। রেগুলার প্র্যাকটিস করবে। অফ টাইমে। আর যখন কলকাতায় যাবে, তোমার কাজগুলো

নিয়ে—

বলতে-বলতে বুকপকেট থেকে কার্ড বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম,—আমার সঙ্গে দেখা করবে। শুধু একটা ফোন করে যেও। একদম হেসিটেট করবে না।...তুমি কোত্থেকে পাস করেছ?

অশেষের মুখে ম্লান হাসি খেলে গেল। বলল,—মুম্বাইয়ের কলা অ্যাকাডেমি থেকে।

—মুম্বাই? কেন? তোমরা কি প্রবাসী বাঙালি?

—নাহ। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলাম। সেবার হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছি। বাবা কিছুতেই আর্ট কলেজে পড়তে দেবেন না। সেই সময় খবর পেলাম, মুম্বাইতে একটা শর্ট টার্ম কোর্স আছে। হাত খরচের পুঁজিটুকু নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম।

—বলো কী! একা চলে গেলে? ওখানে রিলেটিভ কেউ ছিলেন?

—নাহ।

—তবে? মুম্বাই ইস ভেরি এক্সপেন্সিভ সিটি। থাকা-খাওয়া, ছবি আঁকার খরচ, হাউ কুড ইউ ম্যানেজ ইট?

—হ্যাঁ, সুগতদা। খুবই কষ্টে পড়েছিলাম। একটা বড় হোটেলে পার্ট টাইম ওয়েটারের কাজ নিয়েছিলাম। অনেকদিন করেছি। ওখানেই থাকতাম। পরে কলেজের স্যার নাগাপ্পা সিনেমার হোর্ডিং আঁকার কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। তাতে খানিকটা সুবিধে হয়েছিল। টাকা ছাড়াও অয়েলে প্র্যাক্টিসটা হয়ে যেত। এমনিতে ক্যানভাসের যা দাম!

অবাক হয়ে চেয়ে আছি অশেষের মুখের দিকে। কয়েকমুহূর্ত পরে অস্ফুটে বললাম,—তারপর?

—তারপর আর কি! যা হয় অধিকাংশ মানুষের। পাস করার পরও বছরখানেক ওখানে ছিলাম। পুরোদমে হোর্ডিং এঁকেছি। সিনেমার ইনডোর সেটও এঁকেছি। বড়-বড় ডিরেক্টরদের সঙ্গে আলাপ হল। ভিস্যুয়াল শিখলাম। কিন্তু যেটা আমার প্যাশন, ছবি আঁকা, সেই ফিল্ডে কিছু করতে পারলাম না। শরীরটাও গড়বড় করছিল। একা-একা থাকা, খাওয়ার অনিয়ম, শরীরের ওপর অত্যাচার। বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

একটু থেমে আবার বলল,—এই শহরে এসে আরও করুণ অবস্থা। কোথাও পাত্তা পাই না। ড্রইং নিয়ে পত্রিকা অফিসে-অফিসে হন্যে হয়ে ঘুরেছি। কভার-ইলাসট্রেশন, যে-কোনও ছবির কাজ। কেউ সুযোগ দেয়নি। সকলের এক কথা, আগে কোথায় করেছেন? এনি একসপিরিয়েন্স? আরে বাবা, একটা চান্স দিয়ে তো দেখো। কাজ না পেলে অভিজ্ঞতা হবে কোত্থেকে!...শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে এই ড্রইং টিচারের চাকরি নিয়ে মালদা চলে এলাম। কী করব, কতদিন বাড়ির ঘাড়ে বসে খাব, বলুন!

শেষদিকে অশেষের গলার স্বর বুজে এল। আমিও চুপ।

বাইরে নিকষকালো অন্ধকার। একটানা ধাতব শব্দ, মাঝে-মাঝে হুইস্‌লের তীব্র শিস। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে ঘুমন্ত ট্রেন ছুটে চলেছে।

আসলে কী জানেন সুগতদা,—অশেষ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কান্নাভেজা গলায় বলল, আমাদের দেশে জব স্যাটিসফেকশন হয় না। হতে গেলে গডফাদার থাকতে হয়, কনট্যাক্ট থাকতে হয়। এই ধরুন, আপনার সঙ্গে যদি কিছুদিন আগেও দেখা হতো, তাহলে—

আরে, তাতে কী হয়েছে।—আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, সামনে তোমার সারা জীবন পড়ে রয়েছে। তুমি কলকাতায় যাচ্ছ তো? কালকেই সকালে আমার কাছে চলে এসো। কাজকর্ম নিয়ে। আমি দেখব। অবশ্যই দেখব।

অশেষ দুদিকে মাথা নাড়ল। বলল,—থ্যাঙ্কিউ সুগতদা। কিন্তু আর সময় নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর কিচ্ছু করার নেই।

বলতে-বলতে হঠাৎ ও ছটফট করে উঠল। বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখতে-দেখতে বলল,—আমি একটু ঘুরে আসছি। কাজটা শেষ করে আসি।

বলে হন-হন করে ওদিকের কামরার স্যুইং ডোর খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

আমি হতভম্ব। ছেলেটা হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন? কী জরুরি কাজ?

গেছে তো গেছে, আর আসে না। গেল কোথায়? আমারই ভুল হয়েছে, কোন কম্পার্টমেন্টে ওর বার্থ, জেনে নেওয়া হয়নি। উঠে গিয়ে খোঁজ নিতে পারব না।

মনটা ভারী হয়ে গেছে পাথরের মতো। আসলে আমার ছোটবেলাটা অশেষের থেকেও অনেক কষ্টের। বাবা মারা গেছিলেন, যখন আমার দুবছর বয়েস। অর্থকষ্ট যে কী ভয়ানক, প্রতিদিন আমাদের বুঝতে হয়েছে। কষ্ট করে আমায় আর্ট কলেজে পড়ার খরচ চালিয়েছেন আমার বড়দা! তবে পাস করার পরপর পত্রিকা অফিসে চাকরি আর বিকাশদা, ঈশাদা যেভাবে হাতে ধরে শিখিয়েছেন আমায়, সেই হেল্পটা ও পায়নি। বেচারি!...

কথাবার্তা শুনে মনে হল, ছেলেটার ভিতরে আগুন আছে। হাতে নিশ্চয়ই ড্রইং আছে। দেখা যাক, যদি কিছু করতে পারি ওর জন্যে। আমার চিঠি পেলে মনে হয়, কোনও হাউস ওকে ফেরাবে না।

ঘটাং-ঘটাং করতে-করতে ট্রেনের গতি কমে আসছে। এখন কোন্ স্টেশন? বাইরে থইথই অন্ধকার। হয়ত সিগন্যাল পায়নি। আবার কুয়াশাও হতে পারে।

শীতকালে এই এক সমস্যা। পথের ওপর এমন কুয়াশা নেমে আসে যে ট্রেনের সার্চলাইটেও একহাত দূরের কিছু দেখা যায় না। গতমাসে আমার দিল্লি থেকে ফেরার সময় যা হয়েছিল! দশটার রাজধানী পৌঁছেছিল সন্ধে ছটায়।

ঠিক এইসময় ওদিকের স্যুইং ডোর ঠেলে ঝড়ের বেগে অশেষ এল। উদভ্রান্ত দৃষ্টি। আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে কম্পার্টমেন্টের দরজার লকটা মুচড়ে খুলে ফেলল। কিছু বলার সুযোগ পেলাম না।

ট্রেন থেমে গেছে। মিটমিটে হলদে আলোয় একটা মলিন প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছে। তার মানে কোনও ছোট স্টেশন। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি।

পাখির মতো হাল্কা পায়ে টুপ করে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে। তারপর নীচে থেকে ডাক দিল,—সুগতদা, আসুন।

কিছুই বুঝতে পারছি না!

—কোথায় যাব?

—আসুনই না! ভয় নেই, ট্রেন এখন ছাড়ছে না। এই স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

—কেন? কী হয়েছে?

—সেটাই তো দেখাব। নেমে পড়ুন।

নিশির ডাকে পাওয়া মানুষের মতো হাতল ধরে নেমে পড়লাম। জনশূন্য প্ল্যাটফর্ম। সাদা কুয়াশায় ঢাকা। আবছা-আবছা আলোয় স্টেশনের হোর্ডিংটা পড়তে পারলাম। ভেদিয়া। এখানে গৌড় এক্সপ্রেসের থামার কথা নয়। তার মানে ট্রেনের কোনও সমস্যা হয়েছে।

অশেষ একটু দূরে হাঁটছে। আলো-আধারিতে অস্পষ্ট।

ওর গলা শুনলাম,—সুগতদা, ওই দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন?

প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষপ্রান্তে ট্রেনের গায়ে কিছু ছায়ামূর্তি। কিছু টর্চের আলো নড়াচড়া করছে, ভাঙাচোরা কয়েকটি মানুষের অবয়ব। কী হয়েছে? বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। নির্ঘাত লাইনে কিছু গোলমাল। হয়তো ফিশপ্লেট খোলা।

বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। আজকাল যা হচ্ছে। যেখানে-সেখানে, যখন-তখন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। ঘুমের মধ্যে যাত্রীরা লাশ হয়ে যাচ্ছে।

—আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। তার চেয়েও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

ছেলেটা কি থট রিডিং জানে? যত ওকে দেখছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি।

তার ওপর কী দারুণ জোরে হাঁটছে। কিছুতেই ওর কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না।

লোকজনের জটলার কাছাকাছি প্রায় চলে আসছি। বড়-বড় টর্চ ছাড়াও দু-তিনটে লাল লণ্ঠন। নিশ্চয়ই রেলের কর্মী। জোরালো আলোয় ওই জায়গাটুকু বেশ উজ্জ্বল।

অশেষ গেল কোথায়? ওকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

—অশেষ! অশেষ!

কোনও উত্তর নেই। আচ্ছা খ্যাপা ছেলে! আমায় টেনে এনে নিজে কোথায় চলে গেল। ওই জটলার মধ্যে ঢুকে গেল নাকি?

আমার অনুমান অভ্রান্ত। হ্যাঁ, ওখানে অশেষ ছিল।

কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি পৌঁছে গেছি আলোকিত লোকজনের কাছে। জনা পনেরো লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন উবু হয়ে বসে। চার-পাঁচটা বড়-বড় টর্চ মাটির দিকে ফোকাস করা। ওদের ঠিক সামনে প্লাটফর্মে চাদরের ওপরে শুয়ে আছে একজন মানুষ।

আমার মাথা বনবন করে ঘুরছে! শরীর ঝিমঝিম করছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। কাকে দেখছি? মনে হচ্ছে, এখনই টাল খেয়ে পড়ে যাব। একজনের গলা কানে এল,—ডাক্তারবাবু, কী হয়েছিল বলুন তো?

—সম্ভবত সেরিব্রাল। সময় দেয়নি।

ভাগ্য ভালো, প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চির নড়বড়ে হাতল ধরে ফেলেছিল আমার হাত। শরীরের ভার ছেড়ে সেখানেই এলিয়ে পড়েছি। লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে এখনও ওকে দেখা যাচ্ছে কি? নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে অশেষ যেন বলছে, 'সুগতদা! বেশ ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

আর কিছু মনে নেই।

সামনে অ্যাপ্রণ পরা মহিলা আর স্টেথো ঝোলানো ডাক্তার। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গেলাম। কোথায় আমি? সারি-সারি সাদা-সাদা বেড, হাসপাতাল! নার্স আমায় ধরে ফেললেন। ডাক্তার ভদ্রলোক নরম-গলায় বললেন,—আস্তে! আস্তে। আপনার শরীর এখনও দুর্বল। তাছাড়া কাল রাতেই ডায়াজিপাম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে।

নিমেষে সব মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরে কাঁপুনি দিল। অশেষ চোখদুটো এখনও জ্বলজ্বল করছে। আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

ডাক্তার আমার বুকে স্টেথো দিয়ে বললেন,—শরীর খারাপ লাগছে?

খুব চেষ্টা করে বললাম,—নাঃ! ঠিক আছে।...ডক্টর, আমি এখানে এলাম কী করে?

—আপনার বুকপকেট থেকে নেমকার্ড পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ওই ট্রেনে আপনাকে স্পেশাল কেয়ারে এনে অ্যাডমিট করে দেওয়া হয়েছে। আপনি তো বিখ্যাত লোক মশাই।

—আর ও...ওই...যে ছেলেটা, অশেষ...

—যে মারা গেছে, তার কথা বলছেন কি? তাকেও নিয়ে আসা হয়েছে। বডি মর্গে আছে। পুলিশ বলেছিল ও আপনার পরিচিত।

—হ্যাঁ, না...মানে কাল ট্রেনেই প্রথম আলাপ।

—আসলে ওর পকেটে আপনার কার্ড পাওয়া গেছে। ও। কী নাম, কোথায় থাকে বলেছিল?

—তেমনভাবে কিছু বলেনি। নাম হচ্ছে, অশেষ জানা। বলেছিল, কলকাতায় ওর বাড়ির লোকজন থাকেন। ও একা থাকত মালদায়। জেলা স্কুলের ড্রইং টিচার।

যাক। এই ইনফর্মেশনেও অনেকখানি কাজ হবে।—ডাক্তারের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, দাঁড়ান, এখনই আমি পুলিশকে জানাচ্ছি। নতুবা কী হতো জানেন, বাড়ির লোক খবর পেতে-পেতে অনেক দেরি হয়ে যেত। তদ্দিন বডিটা বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মর্গে পচত।

বলতে-বলতে ডাক্তার কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরক্ষণে ঘরে ঢুকলেন আমার স্ত্রী এবং দুই ছেলে। ওদের দেখে আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। বেঁচে থাকার এত আনন্দ, আগে বুঝিনি!

প্ল্যানচেট

'চল্, আজ একবার প্ল্যানচেটে বসি।'

'প্ল্যানচেট? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আত্মা-ফাত্মায় বিশ্বাস করিস নাকি?'

'করি। তুই করিস না?'

'একেবারে না।'

'তাহলে ঠনঠনিয়ার কালীবাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কপালে হাত ঠেকাস কেন?'

'ওটা অব্যেস। তাছাড়া আত্মা আর দেবতা এক হল নাকি?'

'দুটোই অলৌকিক। সুপার ন্যাচারাল। চোখে দেখা যায় না। একে বিশ্বাস করলে ওকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

'গা-জোয়ারি কথা বলিস না! খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এখন মাঝরাতে প্ল্যানচেটে বসব? যত্তসব বুজরুকি, ফালতু ব্যাপার। তার চেয়ে জীবনবিজ্ঞানের 'কোষ' চ্যাপ্টারটা শেষ কর। আর মাত্র তিনমাস বাকি, খেয়াল আছে তো?'

বাবলু চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে চুপচাপ চিন্ময় আর তাপসের ক্যাচাল শুনছিল। আর মুচকি-মুচকি হাসছিল। এবার বলল, 'বুঝলি তপসে, চিনু ভয় পেয়ে গেছে!'

'ভয়? আমি ভয় পেয়েছি?...তুই বল, আমায় কী করতে হবে? একা-একা ছাদে চলে যাব?...একটা বস্তাপচা দুশো বছরের পুরোনো গাঁজাখুরি ব্যাপার। সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয়?'

'পুরোনো মানেই খারাপ, এটা কোত্থেকে প্রমাণ হল? তুই জানিস, প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে খোদ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্ল্যানচেট-চর্চা করেছেন। সবটাই বাজে হলে এঁদের মতো মানুষ করতেন?

'ও, তুইও তপসের দলে!'

'হ্যাঁ। বলছে যখন, একবার করে দেখতে ক্ষতি কী? সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা, যদি কিছু জানা যায়। পাস-টাস করব কিনা।'

'তাছাড়া দ্যাখ,' তাপস বেশ উত্তেজিতভাবে বলল, 'আজকের পরিবেশটাও প্ল্যানচেটের জন্যে আইডিয়াল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, শীতকালে বৃষ্টি। যদ্দুর জানি, আজ বা কাল অমাবস্যা। রাত বারোটা পঁচিশ। গোটা শহর নিঝুম। আমরা তিনজন একসঙ্গে পড়ছি। এরকম ত্র্যহস্পর্শযোগ বারবার হবে নাকি?'

চিন্ময় ছটফট করতে-করতে উঠে দাঁড়াল। ও ভয় পেয়েছে, না বিরক্ত হচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

'প্ল্যানচেট করবি কীসে? তার জন্যে তো একটা তেপায়া টেবিল লাগে। আরও কীসব মিডিয়ম-টিডিয়ম, স্লেট-চক...তাছাড়া মিডিয়মের মধ্যে দিয়ে নাকি আত্মা আসে। কে হবে?'

বাবলু বলল, 'নো প্রবলেম। তেপায়া টেবিল আছে। বাবার ঘরে। ওর ওপর বাবার চশমা-ঘড়ি-বাঁধানো দাঁতের কৌটো আছে। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওগুলো পাশের দেরাজে সরিয়ে রেখে আলতো করে তুলে নিয়ে আসব। নো প্রবলেম।...আর মিডিয়াম? চিনু, তোর রাশি কী রে?

'রাশি? ও মাই গড্! তোরা কোন যুগে পড়ে আছিস বল তো? কুসংস্কারের ঢিবি একেকটা।...মা অবশ্যি একদিন বলছিল, আমার নাকি তুলা রাশি কন্যালগ্ন। অল রাবিশ!'

'ফাইন! মুখে কুসংস্কার বললেও খবর তো সব রাখো চাঁদু। শোন চিনু, আমরা এসব মানি। তোর তুলা রাশি। মানে হালকা রাশি। তুই-ই মিডিয়াম হবি, বুঝলি। আমি স্লেট-পেনসিল জোগাড় করে আনছি। ঠাকুমার আলমারিতে আছে।'

'অ্যাবসার্ড! আমি কিছুতেই মিডিয়াম হব না। বাবলু দ্যাখ, এই বলে দিচ্ছি তোরা যদি দুজনে মিলে এরকম উৎপাত শুরু করিস, আমি এখনই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করব। মেসোমশাই-মাসিমা উঠে পড়বেন।'

'চিনু, বেকার খেপে যাচ্ছিস! তোকে অফারটা দিয়েছিলুম। ভেবে দ্যাখ, তোর শরীরের মধ্যে দিয়ে আত্মা আসত পরলোক থেকে! ওঃ কী থ্রিলিং! একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স হত তোর। যাগ্গে, তুই চাইছিস না, হবি না। ফিনিশ।'

তাপস চিন্তিত মুখ করে বলল, 'তাহলে আমাদের প্ল্যানচেট?'

'আরেকটা সহজ পদ্ধতি আছে। ছোটমামারা একবার করেছিল।'

'কীরকম?'

'টেবিলের সেন্টারে একটা কাঁসার বা পিতলের গ্লাস রাখতে হবে। তার চারদিকে টেবিলে চক দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকতে হবে। বৃত্তটার আড়াআড়ি ভার্টিকাল আর হরাইজেন্টাল লাইন টানতে হবে। চারটে খোপ তৈরি হল। একটা খোপে থাকবে 'হ্যাঁ', পাশেরটায় 'না'। নীচের দুটোর একটায় থাকবে 'অচেনা'। অন্যটা ফাঁকা।

'অচেনা মানে?' তাপস বলল।

'অচেনা মানে অচেনা আত্মা।'

'আর ফাঁকা খোপটা?' চিন্ময় বলল।

'গ্লাসটা যদি ওই খোপে চলে যায়, তার মানে আত্মা বিদায় নিল। ক্লিয়ার?'

'উঁ!' চিন্ময়ের কপালে বিনবিন ঘাম জমেছে।

'তবে, সবচেয়ে আগে তিনটে মোমবাতি জোগাড় করতে হবে।

ঠাকুরঘরে আছে। চিনু, তুই বোস। তপসে চল, নিয়ে আসি।'

'না-না, আমিও যাচ্ছি।...গেলাস আর টেবিলও তো আনতে হবে।'

অতঃপর সব সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে-বসতে প্রায় রাত দুটো। টিপটিপ বৃষ্টি হয়েই চলেছে। নিশুতি, নিস্তব্ধ কলকাতা। মাঝে-মাঝে দু-একটা নেড়িকুত্তার ঘেউ-ঘেউ।

'এবার লাইটটা নিভিয়ে দেব।'

'একমিনিট।' চিন্ময় তাকে রাখা জাগ থেকে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল। তারপর বলল, 'কাকে ডাকবি, ভেবেছিস?'

'রিসেন্টলি যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে থেকে কাউকে ডাকতে হবে। এখনও বেশি উপরের স্তরে উঠতে পারেনি।'

তাপস বলল, 'মাইকেল জ্যাকসনকে ডাকলে কেমন হয়?'

'কী বকওয়াস করছিস? সে তো আমেরিকার লোক। আমাদের পাস-ফেল নিঁয়ে কী করে বলবে?

'তাহলে আলি আকবর?'

'হ্যাঁ। হতে পারে। আমাদের দেশের।'

'মহারানি গায়ত্রী দেবীকেও ডাকতে পারিস। কুচবিহারের মেয়ে।'

'ঠিক হ্যায়। তাহলে প্রথমে গায়ত্রী দেবীকেই ডাকি। না এলে তখন আলি আকবর।...হ্যাঁ, আর একটা কথা। ভেরি ইম্পর্টান্ট।'

তাপস, চিন্ময় তাকাল।

বাবলু বলল, 'ডাকতে হবে আমাদের তিনজনকেই। মনপ্রাণ দিয়ে। এই উলটোনো গ্লাসের তিন দিকে তিনজন আঙুল ছুঁয়ে থাকব। আত্মা এলে গ্লাস আপনি নড়তে শুরু করবে। অনেক সময় নাকি খারাপ আত্মারাও চলে আসে। এলে আর যেতে চায় না।'

'খারাপ আত্মা মানে?' চিন্ময়ের গলা কেঁপে গেল।

'মানে ধর, যাদের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। বোমা-গুলিতে মরেছে, কিংবা গাড়ি-ট্রেনে চাপা পড়েছে। অনেকসময় ফাঁসি হওয়া খুনি-টুনিও ঢুকে পড়ে। তারা তো উঁচুস্তরে যেতে পারে না। মানুষের ক্ষতি করার জন্যে ঘুরঘুর করে।'

'বাবলু!' তাপসও একটু-একটু মিইয়ে যাচ্ছে। বলল, 'ছাড়। বাদ

দে, বুঝলি। ব্যাপারটা বেশ কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে।'

'ছিঃ ছিঃ তপসে! তুই-ই তাল তুললি। এখন ভয় পেয়ে যাচ্ছিস? আরে বাবা, কোনও ভয় নেই। ম্যায় হুঁ না! তোরা শুধু গ্লাসটায় আঙুল ছুঁয়ে মনপ্রাণ দিয়ে মহারানিকে ডাকবি। ভালো মানুষ। চলে আসবেন। সব বলেও দেবেন।'

মোমবাতি তিনটে টেবিলের তিন দিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনটে চেয়ারে গুছিয়ে বসে ঠিকঠিক পজিশন নেওয়া হল। তারপর বাবলু উঠে টিউবলাইটটা নিভিয়ে দিল।

তিনজনে ছুঁয়ে রয়েছে গ্লাস। দমকা হাওয়ায় মোমবাতির শিখা মাঝে-মাঝে কেঁপে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে ছায়া দুলছে। বৃষ্টির ছাঁট ঢুকে পড়ছে। গায়েও পড়ছে দু-চার ফোঁটা। শব্দহীন রাত। শুধু টিপটিপ শব্দ।

হঠাৎ চিন্ময় কেঁপে উঠল। গ্লাসটা কাঁপছে।

বাবলু ফিসফিসিয়ে বলল, 'এসে গেছে রে।'

'আপনি কি মহারানি গায়ত্রী দেবী?'

কাঁপতে-কাঁপতে গ্লাস 'হ্যাঁ' খোপের দিকে এগিয়ে গেল।

'আমাদের প্রণাম নেবেন। আমরা তিনজনেই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আমরা কি ভালোভাবে পাস করব?'

গ্লাসটা 'হ্যাঁ' খোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁপছে থরথর করে।

'তার মানে কি আমরা তিনজনেই পাস করব?'

গ্লাসটা সটান চলে গেল 'না' খোপে।

'যা ব্বাবা!' তাপস বিড়বিড় করল।

বাবলু বলল, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না রানিমা। দয়া করে বলুন, আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট আপনি জানাতে পারবেন?'

গ্লাসটা 'না' খোপে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড কাঁপল। তারপর সোজা 'ফাঁকা' খোপে গিয়ে কাত হয়ে পড়ল।

'এ কী হল রে বাবলু?'

'উত্তর দিলেন না। তার মানে জানেন না উনি।...চলে গেছেন।'

চিন্ময় লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে টিউবলাইট জ্বেলে দিল। জাগ থেকে ফের জল খেতে গিয়ে গেঞ্জি ভিজিয়ে ফেলল। হাত এখনও কাঁপছে।

'নারে! অনেক হয়েছে। আর দরকার নেই। চল, সব ফেরত পড়তে বসি।'

'চুপ কর চিনু! আমাদের উত্তরটা জানাই হল না। কাজের কাজই হয়নি। আরেকবার চেষ্টা করতেই হবে।'

'এবার কাকে ডাকবি?' তাপস বলল।

'আলি আকবরকে। ভালোভাবে ডাক তো।' বাবলু উঠে গিয়ে লাইট নিভিয়ে দিল।

তিনজনে আঙুল দিয়ে গ্লাস ছুঁয়ে আছে। ঘরের মধ্যে মোমবাতির ছায়া আবার কাঁপছে। বৃষ্টি এখন জোরে শুরু হয়েছে। পাশের বাড়ির টিনের চালে ঝমঝম শব্দ।

চিন্ময়, তাপস দুজনেই ঘামতে শুরু করেছে। কারণ, আবার গ্লাস নড়ছে। আশ্চর্য বটে বাবলুর নার্ভ। এখনও স্টেডি!

'আপনি এসে গেছেন?'

গ্লাস 'হ্যাঁ'-এর খোপে।

'আপনি কি খাঁ সাহেব? আপনাকে আদাব।'

সর্বনাশ! গ্লাস চলে গেল 'না'-এর ঘরে।

'ত্-তবে?'

গ্লাস চলে গেল 'অচেনা'-র ঘরে।

চিন্ময়ের আঙুল থরথর করে কাঁপছে। অচেনা মানে 'খারাপ' আত্মা!

'আপনি কি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন?'

গ্লাস 'না'-এর ঘরে।

'তবে আপনি চলে যান প্লিজ।'

কী ভয়ানক। গ্লাস ওখানেই দাঁড়িয়ে ঠনঠন কাঁপছে! তার মানে ও কি যেতে চাইছে না?

চিন্ময় স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওদের চারপাশে, ঘরের মধ্যে অদৃশ্য কেউ যেন রয়েছে। ভারী হয়ে উঠেছে সারা শরীর। উঃ! আর পারা যাচ্ছে না। উঠে লাইট জ্বালিয়ে দেবে? নাঃ, শরীরটা অবশ হয়ে গেছে! পারছে না।

'আপনি যাবেন না?'

গ্লাস 'না'-এর খোপে দাঁড়িয়ে আরও জোরে কাঁপতে লাগল।

চিন্ময় কি অজ্ঞান হয়ে যাবে? পাশে কে যেন জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে! কে—তাপস? দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে...!

ও কে? ও কে? হঠাৎ সাদা এক ছায়া মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়!

আঁ—আঁ—আঁ!

চিন্ময় চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে গেল।

'কীরে, তোরা—এ কী? কী হল?'

বাবলু তড়াক করে উঠে লাইট জ্বালিয়ে দিল। তাপস ঝুঁকে পড়েছে চিন্ময়ের ওপর, 'চিন্ময়, চিন্ময়! দ্যাখ, দ্যাখ মাসিমা। মাসিমা এসেছেন।...'

বাবলুর মা দরজায় দাঁড়িয়ে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন।

বাবলু জাগ থেকে জল নিয়ে ছেটাচ্ছে চিন্ময়ের চোখে-মুখে।

'তোরা লেখাপড়া না করে এসব কী করছিলি এতরাতে?'

'প্লিজ মাসিমা!' তাপস গিয়ে মাসিমাকে জড়িয়ে ধরল, 'কাউকে বলবেন না! আমরা একটু প্ল্যানচেট-খেলা খেলছিলুম! আর কোনওদিন হবে না। এবারের মতো ক্ষমা করে দিন।'

'অ্যাই চিনু! চিনু!'

চিন্ময় অবশেষে চোখ মেলল। ফ্যালফেলে ভয়ার্ত দৃষ্টি।

'প্লিজ চিনু! সরি। ওই দ্যাখ, আমার মা।'

'গ্ল্-গ্লাস এ-এখনও নড়ছে?'

'নারে। নড়ছে না। সবটাই বাজে, ভুয়ো। তোকে ভয় দেখাতে আমিই গ্লাসটা চালচ্ছিলাম।'

চিনু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চারিদিক দেখল। তারপর বোকার মতো হেসে বলল, 'আমি গোড়াতেই সন্দেহ করেছিলাম। তোর চালাকি ধরেও ফেলতাম। নেহাত মাসিমা হঠাৎ এসে পড়ে সব গন্ডগোল করে দিলেন।'

ঠাকুরমশাই

দিবাকর ছুটছিল। ছুটছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

পিছনে ধাওয়া করে আসছে চারটে হায়েনা। ওদের পাণ্ডার চিৎকার ভেসে এল, 'ছোট্, ছোট্! ঠিক ধরে ফেলব। পালাবে কোথায়? সঙ্গে বড় মাল আছে!'

দিবাকর দিশাহারা! পকেটে সোনার হারটা ঝনঝন করে বাজছে। বাঁ-দিকে ঘুঘুডাঙার বিস্তীর্ণ জঙ্গল, ডানদিকে ধু-ধু মাঠ। কাছেপিঠে কোনও লোকালয় নেই। আঁকাবাঁকা পিচরাস্তা চলে গেছে একটানা।

কী করবে দিবাকর? শিকার ও শিকারিদের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে...!

জঙ্গলে ঢুকে পড়বে? তারপর? ও জঙ্গলে দিনমানেও সচরাচর মানুষ

ঢোকে না। শেয়াল, খটাস, বুনোবেড়াল, সাপখোপ তো আছেই, এমনকী দু-একজন 'বড়মিঁয়া' থাকাও অসম্ভব নয়। কিছুদিন আগে প্রবল ঘূর্ণিঝড় সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। সে সময় ওদের পাশের গ্রামেই এক বড়মিঁয়া এসে ঢুকেছিল নদী সাঁতরে। আশ্রয়ের খোঁজে। সুন্দরবন তো বেশিদূরে নয়।

সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

একমুহূর্ত ভাবল দিবাকর। পিছনে দ্বিপদ শ্বাপদ, জঙ্গলেও হয়তো চতুষ্পদ! যা হোক, হবে। ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে।

ওঃ! কী মিশমিশে অন্ধকার! কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। লতাঝোপে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। চারদিকে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছেরা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে কালো দেয়ালের মতো।

চপ্পলটা কখন যে পা থেকে ছিটকে পড়েছে! কাঁটা ফুটে খচখচ করছে।

দিবাকর অন্ধের মতো গুঁতো খেতে-খেতে বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর দাঁড়াল। ওরা কি আসছে? শয়তানগুলো?

নিঃশব্দ নিকষকালো চর্তুদিক। গাছের ডালে-কোটরে ওর শব্দ পেয়ে কয়েকটা পাখি কিচিরমিচির করে উঠে ছিল, আবার চুপ করে গেছে।

হ্যাঁ। ওরা আছে। জঙ্গলের বাইরে থেকে কথা ভেসে আসছে।

'কীরে? চল্, ঢুকে পড়ি। কদ্দুর আর যাবে?'

'না-না। একটু দাঁড়া। নানারকম জানোয়ার আছে। তাড়া খেয়ে ব্যাটা ঠিক বেরিয়ে আসবে।'

'নয়তো বাঘের পেটে যাবে। একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক্। এক কাজ কর তো পচা, তুই ফিরে গিয়ে দুটো টর্চ আর খানকতক সড়কি নিয়ে আয়। আমরা এখানে বসি। তুই এলে ঢুকব।'

'ঠিক বলেছিস। বাঘে ওটাকে খেলেও মালটা তো থাকবে। যা-যা পচা, দেরি করিস না।'

শিউরে উঠল দিবাকর। ওরা ওকে না ধরে এখান থেকে

নড়বে না।

চোখ ফেটে কান্না আসছে দিবাকরের। আর বোধহয় বাড়ি ফেরা হবে না। দেখা হবে না বাবা-মা-দিদির সঙ্গে।

ধামাখালির কুসুমবিবির পাইস হোটেলে কাজ করে দিবাকর। ওখানেই থাকে। রাতে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে। ভোর থেকে প্রথমে চা-বিস্কুট-ঘুগনি-রুটি, বেলাবেলি হয়ে যায় ভাতের হোটেল। বাসের কন্ডাকটাররা মাসকাবারি খায়। কখনও-কখনও দু-চারজন সুন্দরবন বেড়াতে আসা টুরিস্টও।

কুসুম চাচি মানুষ ভালো। অনেক খেটেখুটে হোটেলটা দাঁড় করিয়েছে। তিনকূলে কেউ নেই। কবে বর মরে গেছে। ছেলের মতো ভালোবেসে দিবাকরকে। টাকাপয়সা ভালোই দেয়। চাচি যা খায়, দিবাকরও তাই খায়। পেছনে দরমার ঘরে চাচি রাতে শোয়, একপাল পোষ্য কুকুর নিয়ে দিবাকর বেঞ্চিতে।

পনেরোদিন আগে বকুলপুর থেকে বাবা ফোন করেছিল। পাশের এস.টি.ডি. বুথে।

'দিবু, তোর দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

'তাই নাকি বাবা? ওঃ, দারুণ।'

'হ্যাঁরে, পাত্র ভালো। জমিজিরেত আচে। সাইকেলের দোকান আচে। বাপ-মা'র এক ছেলে। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, বুইলি!'

'ওঃ, দিদির ভাগ্য কী ভালো! কী মজা হবে। বর দেখতে কেমন গো, বাবা?'

'মন্দ নয়। শোন বাবা, একটা সমস্যায় পড়ে গিচি।'

'সমস্যা? কী বাবা?'

'ওরা সামনের বিয়ের তারিখেই কাজ সেরে ফেলতে চায়। ছেলের দাদুর শরীল খারাপ, কখন কী হয়ে যায়। তাই।'

'সে তো ভালোকথা বাবা।'

'ভালো তো কথা। কিন্তু...নাহ্ দিবু, তোর পনরো বছর বয়েস হল, বুদ্ধি পাকল না!'

'কেন বাবা?'

'আরে বাপ, বিয়ের জোগাড়যন্তর আছে না? লোক খাওয়াতে হবে, ছেলেকে সোনার বোতাম, আংটি দিতে হবে। তাছাড়া টাকা? এত তাড়াতাড়ি কোত্থেকে জোগাড় করব, বল? ওরা অবিশ্যি দাবি-দাওয়া কিছু করেনি। তবু...আমাদের একটামাত্র মেয়ের বিয়ে...কীরে, শুনছিস?

'উঁ!'

'শোন, আমি এদিকে চেয়েচিন্তে পেরায় জোগাড় করে ফেলিচি। তোর মায়ের কাছেও কিছু ছিল। তোর দিদির হারটা আর কুলোতে পারচি না। কমসম করেও প্রায় দশহাজার তো লাগবেই।'

'বাবা, বাবা, আমি চেষ্টা করব?'

'তুই? তুই কোত্থেকে পাবি বাপ্?'

'চাচির কাছে তো আবার সব টাকাই আছে। উনি রেখে দেন। যদি কম পড়ে, আব্দার করে ধার চাইব। বলো বাবা, দেবে না?'

'দ্যাখ বাপ। তবে চাপ দিস নে। কুসুমভাবী মানুষ বড় ভালো। তোকে বড় ভালোবাসে।'

সত্যিই দিবাকরের এই এক বছরে অনেক টাকা জমে গেছিল। সাত হাজার টাকা। আর দিদির বিয়ের কথা বলতেই চাচি একগাল হেসে বলেছে, 'এখনই হলধরভাইকে ফোনে বলে দে। বাকিটা আমি দিয়ে দিব। তুই তো আর পালিয়ে যাচ্ছিস না বাপ।'

সব শুনে বাবা কী নিশ্চিন্ত। পরদিনই ফোন করে জানাল, সরবেড়িয়ায় হারু স্যাকরার দোকানে বলা আছে। হার পছন্দ করে দুশো টাকা বায়না দিয়ে এসেছে। দিবাকর বিয়ের আগের দিন আসার সময় বাকি টাকা দিয়ে যেন নিয়ে আসে।

ঠিক ছিল, সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু শনিবার ভোরবেলা থেকে এমন টুরিস্টবাবুদের ভিড় লাগল! চাচিকে একা ছেড়ে দিবাকর বেরোয় কী করে? তার ওপর একটা ফ্যামিলি নদীর ভেড়ির মাছ এনে আব্দার জুড়ল, রেঁধে দিতে।

কলকাতার দিকের বাসে যখন উঠল দিবাকর, তখন প্রায় চারটে। সরবড়িয়ায় পৌঁছল পাঁচটা নাগাদ। ওর প্যান্টের পকেটভরতি গজগজে টাকা।

হারু স্যাকরা সবে দোকান খুলেছে। ও যখন ঢুকল, দেখেছে, পাশের চায়ের দোকানে চার-পাঁচটা লোক ওকে লক্ষ করছিল। আমল দেয়নি। সোনার হারটা রেশমি থলিতে মুড়ে হারু যখন ওর হাতে দিল, তখন যে কী আনন্দ হচ্ছিল। দিদির বিয়েতে 'ছোট' ভাই দিচ্ছে।

তখনও সরবেড়িয়া গঞ্জ সরগরম। টানা রাস্তা দিয়ে হুসহুস করে গাড়ি যাচ্ছে, ধামাখালির বাস আসছে, থামছে। ট্রেকার আসছে মালঞ্চর দিক থেকে। অনেক লোকজনের ভিড়।

দিবাকর দোকানের বাইরে বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। লক্ষ করল, সেই লোক চারটে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছে। ফুকফুক করে বিড়ি ফুঁকছে।

বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে-করতে প্রায় মিনিট পনেরো পেরিয়ে গেল। অবাক হচ্ছিল দিবাকর, ঘটকপুরের দিক থেকে গাড়ি-বাস আসছে, কিন্তু ধামাখালির দিক থেকে কোনও গাড়ি আসছে না কেন?

পাশের পানের দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করল।

পানওয়ালা বলল, 'মনে হয় কিছু গোলমাল হয়েছে। অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে। আজ আর বাস পাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

দিবাকর ফের হারুর দোকানে এসে ঢুকল।

'কী হে! ফিরে এলে?'

'না কাকু, বাস আসছে না।'

'হুঁ। তাই দেখছি। কী করবে বলো তো? আমার দোকানে রাতটা থেকে যাবে?'

'কাকু, কাল যে দিদির বিয়ে। সকাল থেকে গায়ে হলুদ, তত্ত্ব, রান্নাবাড়ি...বাবা একদম একা।'

'কিন্তু যাবে কী করে? বকুলপুর তো কাছে পিঠে নয় বাবা। কমসে কম চোদ্দো-পনেরো মাইল। হাটুরেগ্রামের পর ঘুঘুডাঙার জঙ্গল, তারপরও বেশ খানিকটা।'

'উঁ।'

'তুমি এক কাজ করো। রাতে আমার এখানে থেকে যাও। আমার সাথে রুটি-তরকারি খেয়ে শুয়ে পড়ো। কাল সকালে আমি দোকান বন্ধ

করে ঘরে ফিরব। তুমি ভোরের বাস ধরে চলে যেও।'

দিবাকর মারাত্মক ভুল করল।

'না কাকু, মন বড় টানছে গো। বাবার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে। এগিয়ে যাই। রাস্তায় কিছু-না-কিছু ঠিক পেয়ে যাব। নয়তো জোরে-জোরে হাঁটা লাগাব, তিন-চার ঘণ্টায় পৌঁছে যাব ঠিক। বড়জোর রাত দশটা বাজবে।'

হারু স্যাকরা তবু ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে, দিবাকর শোনেনি।

তারপর?...

গঞ্জ পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দিবাকর দেখেছে, চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ওই চারজনও অনেকটা দূরে-দূরে আসছে। নিজেদের মধ্যে হাসি-মস্করা করছে। তখনও দু-চারজন সাইকেল-লোক, এক-দুটো ট্রেকার, অটো যাওয়া-আসা করছিল।

আরও কিছুটা এগোতে একেবারে সুনসান হয়ে গেল পিচরাস্তা। দু-দিকে মাছের ভেড়ি, ধানক্ষেত। লোকালয়ের চিহ্ন নেই। নিস্তব্ধ চতুর্দিক।

পিছনে পায়ের শব্দ। দিবাকর পিছন না ঘুরেই বুঝতে পারল, ওই চারটে ষণ্ডা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্যস! আর পেছোবার উপায় নেই। দিবাকর টের পেয়ে গেছে। সে ছুটতে শুরু করল জনশূন্য রাস্তা দিয়ে। ছুটছে...ছুটছে...তারপর!...

অন্ধকারে চোখ এতক্ষণে অনেকটা সয়ে গেছে। থোকা-থোকা জোনাকি ঘিরে আছে গাছে-গাছে। ঠিক যেন টুনিবাল্‌ব দিয়ে সাজানো। জ্বলছে-নিভছে।

লুঠেরাগুলোর অনেকক্ষণ সাড়া পাচ্ছে না। চলে গেছে? জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটু দেখবে?

'দাঁড়াও। বৎস, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

দিবাকর চমকে উঠল। ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন মানুষ। প্রসন্ন চেহারা, ধুতি পরনে। খালি গা, সাদা পৈতে ধবধব করছে।

মানুষটির ডানহাতে একটি কমণ্ডলু, বাঁ-হাতে একটি লাঠি। একটু

দূরে একটি জন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

হতবুদ্ধি দিবাকর তাকিয়ে থাকে। কে ইনি? এত রাতে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে মানুষ? দৈবপ্রেরিত? নাকি সাক্ষাৎ ভগবান?

মানুষটি কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন দিবাকরকে। তারপর বললেন, 'মনে হইতেছে, তুমি ভয়ার্ত। নতুবা এই অরণ্যে রাতে কোনও মনুষ্য কদাপি প্রবেশ করে না। কোথায় নিবাস বৎস?'

দিবাকর হাত জোড় করে বলল, 'অ-আজ্ঞে ব্-বকুলপুর। আমি...আমি...'

কম্পমান গলায় সে তার কথা একটু-একটু করে বলে গেল।

'বুঝিয়াছি। হুম। তুমি হলধরের পুত্র?'

'আ-আপনি বাবাকে চেনেন?'

'চিনিব না?' মৃদু হাসলেন মানুষটি, 'এই দিগরের প্রায় সকলকেই আমি চিনিতাম। তোমার পিতার বিবাহ আমিই দিয়াছিলাম। বুঝিলে?'

'আজ্ঞে। আ-আপনি তবে ঠাকুরমশাই?'

'হ্যাঁ বৎস। তোমার বাবাকে বলিও। পরীক্ষিৎ ঠাকুর বলিলেই চিনিবে। চলো। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যাক।'

'কি-কিন্তু ঠাকুরমশাই, বাইরে রাস্তায় যে ওই পাজি লোকগুলো?'

'দেখাই যাক্ না।' আবার মৃদু হাসলেন পরীক্ষিৎ ঠাকুর, 'ভয় পাইও না! সর্বদা মনে রাখিবে, যাহারা অন্যায় করে, অত্যাচার করে, তাহারা কাপুরুষ! রুখিয়া দাঁড়াইলে পুচ্ছ তুলিয়া পলায়ন করে। আমি আছি, কোনও ভয় নাই। আইস আমার সাথে।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দিবাকর পরীক্ষিৎ ঠাকুরের পিছন-পিছন এগিয়ে চলল।

একটু এগোতেই চাঁদের আলোয় চকচকে পিচরাস্তা দেখা গেল। গলাও পাওয়া গেল ওদের। সাগরেদটি টর্চ ও আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছে। কোনদিক দিয়ে ওরা জঙ্গলে ঢুকবে, সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ চলছে।

পরীক্ষিৎ ঠাকুরের মুখে এক অদ্ভুত কাঠিন্য ফুটে উঠল। মৃদুস্বরে

বললেন, 'ইহাদের বড় বাড় বাড়িয়াছে! আইস বৎস দিবাকর, সম্মুখে আইস। এইটি ধরো।'

লাঠিটি ধরিয়ে দিলেন দিবাকরের হাতে। কমণ্ডলু থেকে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে দিলেন ওর গায়ে। শরীরে দিবাকরের কাঁটা দিল।

'যা-ও! ওই ভ্রষ্টাচারীদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও।'

মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেল দিবাকরের মধ্যে। একলাফে ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে পড়ল লোকগুলোর সামনে। মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর গর্জন, 'আয় দেখি!'

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ও নিজেকেই দেখছে। ওর ছোট্ট শরীরটা ঝাঁকড়া গাছের মাথার সমান-সমান হয়ে গেছে, লোকগুলোকে কত নীচে ছোট-ছোট বেড়ালছানার মতো দেখাচ্ছে। হাতের লাঠিটা হয়ে গেছে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল!

লোকগুলো কয়েকমুহূর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুটিসুটি মেরে গেল। তারপরেই, 'ওরে বাবারে...মারে...ভূ-ভূত!' চিৎকার ছাড়তে ছাড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

দিবাকরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে নিশুতি কাঁপানো অট্টহাসি, 'হাঃ হাঃ হাঃ।'

'দেখিলে বৎস, দেখিলে? কাপুরুষরা কীরূপ পলায়ন করিল!'

মৃদু হেসে দিবাকরের পিঠে হাত রাখলেন পরীক্ষিৎ ঠাকুর।

দিবাকর অবাক হয়ে দেখল, ও আবার আগের মতো! ত্রিশূল আবার লাঠি হয়ে গেছে।

'এসব কী ঠাকুর?...আ-আপনার মায়া।'

বিহ্বল হয়ে প্রণাম করতে গেল পরীক্ষিৎকে। উনি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে হাত তুলে বললেন, 'থাক-থাক। জয়তু বৎস।'

তারপর একটু চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললেন, 'কিন্তু বৎস, তোমার গ্রামে কী করিয়া যাইবে? এইস্থান হইতে সেই পল্লী এখনও বেশ দূর। হুম!... বেগবান! আইস।'

জঙ্গলের আবছা আলোয় যে জন্তুটিকে দেখেছিল দিবাকর, সেটি একটি ঘোড়া। চিঁহিঁ-হিঁ রব তুলে পথে এসে দাঁড়াল!

'উঠিয়া পড়ো। বেগবান তোমায় বকুলপুর পল্লীর নিকটে নামাইয়া দিয়া আসিবে। কেমন? আশীর্বাদ করি, তোমার ভগিনীর বিবাহ সুসম্পন্ন হউক।'

দিবাকরের চোখে জল এসে গেল।

'বৎস, কাহাকেও আজকের কথা বলিও না। কিছু কথা গোপন রাখা ভালো। শুধু হলধরকে পৃথকভাবে বলিবে, পরীক্ষিৎ ঠাকুরমশায় আশীর্বাদ করিয়াছেন। যাও বৎস।...বেগবান...!'

বাড়িতে আলো জ্বলছিল। পাড়ার কয়েকজন জেঠিমা-খুড়িমা মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল। বাবা দাওয়ায় বসে খুড়োদের সঙ্গে বিড়ি টানছিল।

'দিবু, তুই? এত রাতে? কীভাবে এলি?'

ওকে দেখেই সব উঠে দাঁড়াল।

'চলে এলাম। হেঁটে। বাস বন্ধ হয়ে গেছিল।'

'হেঁটে এলি? এতটা পথ, জঙ্গল পেরিয়ে?'

'হ্যাঁ বাবা। কোনও অসুবিধে হয়নি। এই নাও, দিদির হার।... আর হ্যাঁ, পরীক্ষিৎ ঠাকুরমশাই তোমায়, আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন।'

'পরীক্ষিৎ ঠাকুর? কে বল তো?'

'ওই যে গো। পুরুতমশাই। তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন।'

'অ্যাঁ...!! সে কী!...তেনাকে তুই...কোথায়?...রাম...রাম! চল, ভিতরে চল!'

দুই জন

মশাই, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—কী ব্যাপার?

—বলছি, তখন থেকে আমার পাশে-পাশে ঘুরঘুর করছেন কেন? মতলবটা কী?

—মানে!

—সেই মানেটাই তো জানতে চাইছি। এই আধঘণ্টা ধরে যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন! চিটেগুড়ের ওপর মাছির মতো লেপটে আছেন আমার সঙ্গে।

—হোয়াট! কী বলতে চাইছেন, অ্যাঁ? এই লেক, বাগান সব আপনার বাপের জমিদারি? কী মনে করেন নিজেকে? আপনি যেখানে যাবেন, আর

কেউ সেখানে যেতে পারবে না! ছোটলোক, ইতরের মতো কথাবার্তা!

—কী-ই? আমায় ইতর বললেন?

—নো-ও! ইতর বলিনি। বলছি, আপনার কথাবার্তা পাক্কা ছোটলোক, ইতরের মতো। বলেছি, বেশ করেছি।

—বেশ করেছেন?

—হ্যাঁ, করেছি। একশোবার বলব। সত্যি কথা বলতে আমি কোনওদিন ভয় পাইনি।

—সত্যি কথা?

—নয়তো কী। কী ফ্যাচাং রে বাপু! আপনি ফুচকাওলার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন বলে আমি দাঁড়াতে পারব না? আমি কি চোর, না পকেটমার?

—সেটাই তো সন্দেহ করছি। ফুচকা থেকে ঘুগনির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, গেলেন কেন পেছু-পেছু? বলুন?

—গেলাম কেন? আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে? নেহাত আমি ভদ্রলোক, তাই বলছি। ফুচকার ভিড় যখন পাতলা হয়ে এল, তখনই নাকে ভেসে এল ঘুগনির গন্ধ। আঃ, কী প্রাণকাড়া গন্ধ! নিভে আঁচে ঝোলটুকু চিড়বিড় করছিল, মটরের গন্ধ উড়ছিল। তাই গেছি। হয়েছে?

—বুঝলাম। আপনি বেশ লোভী।

—আর আপনি?

—হ্যাঁ। আমিও একটু লোভী। যাক্‌গে, এখন কী করবেন ভেবেছেন কিছু?

—সে আপনাকে কেন বলব? যাক্ গে, আমি তো আপনার মতো 'ইয়ে' নই! তাই বলছি। প্রথমে যাব ওই, ওইদিকে। ভেলপুরি বানাচ্ছে, লাল-লাল সস দিয়ে নাড়ছে। ওখানে একটু দাঁড়াব। তারপর যাব বাদাম, ঝালমুড়ি...

—শুধু দেখবেন? খাবেন না?

—নাহ্! এই বয়েসে ওসব চলে? এখন দেখে আনন্দ। গন্ধ শুঁকেই সুখ। আপনি খান না গিয়ে!

—দূর মশাই! আমায় কি আপনার কচি বাচ্চা মনে হচ্ছে? সব বারণ! চলুন, একটু বসি গে। বেঞ্চিটা ফাঁকা আছে।...বুঝলেন মশাই, কিস্যু আর

ভাল্লাগে না।...ও মশাই, শুনছেন?

—শুনছি। একটু থামুন। ওদিক থেকে খোলাসুদ্ধু বাদাম ভাজছে, গন্ধ পাচ্ছেন কি? কী গন্ধ! গরম-গরম বাদাম। মটমট করে খোলা ভাঙো, আর ভেতর থেকে টুকটুক করে লালচে বাদাম বেরিয়ে আসবে। ভাঙো আর খাও। কী সোয়াদ!

—হুঁঃ! এ সব এককালে কত খেয়েছি। বিকেল হলেই লেকের ধারে চলে আসতুম। কোনওদিন বাদাম, কোনওদিন আলু-কাবলি, কোনওদিন ঘুগনি। একটা কথা বলব? রেগে যাবেন না তো?

—রাগার মতো কথা না বললে রাগব কেন? বলুন। বলে ফেলুন।

—মশাই কি এ এলাকায় নতুন এসেছেন? আমি ডেইলি প্যাসেঞ্জার। আপনাকে তো কোনওদিন দেখিনি।

—তা একরকম নতুনই বটে। শহরের উত্তরে ছিলাম। পরশু ঝড়ে সব ভেঙে-টেঙে গেল। তবু কালকেও কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়েছি। সারারাত এত কাকের চেঁচানি, ঘুমোতে পারিনি। শেষে বিরক্ত হয়ে আজ সকালে চলে এসেছি। দেখলাম, এই এলাকাটা বেশ ভালো। নিরিবিলি। গাছগাছালি।

—ঠিকই। দক্ষিণে এখনও এই বড় লেকটা আছে বলে খানিকটা ফাঁকা-ফাঁকা আছে। তবে এখানে জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল। এত ডিম্যান্ড! বেশ চটপট পেয়ে গেলেন দেখছি?

—তা গেলাম। একজনের জন্যে কতটুকু আর জায়গা লাগে?

—তা বটে। কতদূরে উঠেছেন মশাই?

—কাছেই। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে চলে এলাম। বিকেলটা ভারি সুন্দর। এত খাবার, এত বাচ্চা-কাচ্চা। জানেন, আমি দুটো জিনিস খুব ভালোবাসি। বাচ্চাদের টকঝাল খাবার আর বাচ্চা।

—আরে! আপনার সঙ্গে আমার দেখছি অনেক মিল আছে। সরি, গোড়ায় না-বুঝে অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

—না-না, ঠিক আছে। আপনার আর দোষ কী! দিনকাল মোটেই সুবিধের নয়। চারিদিকে চোর-পকেটমার-খুনি গিজগিজ করছে। সন্দেহ না করে উপায় কী! পুলিশগুলো কিস্যু করতে পারে না। বেশিরভাগ লোক মুখোশ পরে ঘুরছে।

—ঠিক বলেছেন! আমার কী হয়েছিল, জানেন? এই লেকে বসে থাকতে-থাকতে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ চোখের ওপর টর্চের আলো। একটা হাবিলদার। ব্যাটা বলে কি, 'এখানে এত রাতে কী করছেন? চলুন, উঠুন।' বললুম, 'কোথায় যাব?' বলে, 'থানায়। রাত আটটার পর লেকে থাকা বে-আইনি। আমাদের অর্ডার আছে।' শেষে হাতে-পায়ে ধরে পকেটের পঞ্চাশটি টাকা নচ্ছারটার হাতে গুঁজে দিয়ে রেহাই পেলুম।

—বলেন কী? পরদিন সকালে থানায় গিয়ে বলেননি কিছু?

—মাথা খারাপ! রিপোর্ট করে কিছু হয় নাকি? এখন জোর যার, মুলুক তার।...চলুন, উঠি।

—কেন? কোথায় যাবেন?

—কোথায় আর যাব? এখানেই হাঁটি। দেখছেন না, দুটো বাচ্চা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এদিকে আসছে। বাচ্চাদের বসাবে। ছোটটাকে দুধ খাওয়াবে বলে বউটা ব্যাগ থেকে ফিডিং বটল বের করছে।

—হ্যাঁ, তাই তো।...এখন কি বাড়ি ফিরবেন?

—কোনও তাড়া নেই। অবশ্য আমায় এখন আর পুলিশ, গুন্ডা, পকেটমার কিছুই করতে পারবে না।

—তবে প্রথমে ভয় খাচ্ছিলেন কেন?

—অব্যেস! দেখুন কাণ্ড, এতক্ষণ কথা বলছি, নামই জানা হয়নি আপনার। আমি বিরুপাক্ষ বটব্যাল।

—আমি পুণ্ডরীকাক্ষ পালধি। বিরুপাক্ষবাবু, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

—কোথায় এগোবেন? আমি তো হুস করে পৌঁছে যাব। বরং আপনি আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছেন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—বাড়ি? হাসালেন মশাই। একজনের জন্যে বাড়ি লাগে নাকি?

—আহা, বাড়ি না হোক, থাকার ঘর তো লাগে। নিদেন একটা খাট?

—না-না, আমার ওসবের বলাই নেই। যেমন-তেমন একটা জায়গা হলেই হল। শুয়ে পড়ি। একঘুমে রাত কাবার।

—বাঃ-বাঃ! বলেন কী! আপনি নির্ঘাত যোগী মশাই। সত্যি করে

বলুন তো, আপনি কে? প্লিজ।

—সত্যি বলছি, আমি কিছুই না। নোবডি। আমার কথা বাদ দিন। আপনার বাড়িটা একটু দেখে আসি। অন্তত অবসর সময়ে এসে একটু গপ্পোগাছা করা যাবে।

—বাড়ি? হ্যাঁ, আমার একটা বাড়ি আছে বটে। রাস্তার ওপারে। ছেলে বউমা নাতি-নাতনি থাকে।

—আপনি থাকেন না?

—থাকি, আবার থাকি না। মানে আমার ঠিক থাকার দরকার পড়ে না। জায়গা লাগে না।

—কী হেঁয়ালি করছেন বলুন তো মশাই?

—এর বেশি বললে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আপনি এক-ছুটে পালিয়ে যাবেন।

—পালিয়ে যাব?

—হ্যাঁ, যদি বলি, আমি 'পাস্ট টেন্স', আপনি ভয় পাবেন না? আমার শরীর নেই, ভগবানও যা, আমিও তাই, নিরাকার, তাহলে আমি হলাম গিয়ে কী? বুঝলেন কিছু?

—ভূত! আপনি ভূত?

—দেখলেন, আপনি ভয় পাচ্ছেন? এইজন্যেই বলতে চাইনি। আপনি খামোকা জোরজার করলেন।

—ভূত? আপনি ভূত? বাঁচালেন মশাই! ওফ্! ভয় পাব কেন? আমার যে বড্ড আনন্দ হচ্ছে।

—আনন্দ হচ্ছে! আমি ভূত জেনেও আপনি ভীত হচ্ছেন না?

—মোটেই না। সঙ্গীর অভাবে অ্যাদ্দিন একা-একা ঘুরছিলাম। থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম না! এখানে জায়গাও পেলাম, বন্ধুও পেলাম। আমার আনন্দ হবে না তো কার হবে? আপনার?

অসীম সব জানে

—কালকের কী প্রোগ্রাম? কিছু ঠিক করেছিস?

—নারে। ঠিক করে ফ্যাল। আমি আছি।

—আজ?

—কিচ্ছু না। বিন্দাস রেস্ট। প্রচুর ম্যাগাজিন জমে গেছে। মা অ্যাদ্দিন ছুঁতে দেয়নি। আজ সেগুলো গিলব।

—জানিস, আজ রাতে মেগা-চ্যানেলে র‍্যাম্বো দেখাবে।

—র‍্যাম্বো? সিলভেস্টার স্ট্যালোন?

—ইয়েস। মিস করিস না।

ক্লাস এইটের শেষ পরীক্ষা দিয়ে উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরল রণিত। আঃ! এ বছরের মতো মুক্তি। আর ওই চ্যাপ্টারগুলো পড়তে হবে না।

রেজাল্ট বেরোনো পর্যন্ত এনতার ছুটি। মা-বাবার প্যানপ্যানানি নেই। এ ক'দিন শুধু জমিয়ে আড্ডা, বেড়ানো, সিনেমা আর গল্পের বই।

কীভাবে যে রণিত পরীক্ষা দিল এ বছর! পরীক্ষায় আদৌ বসতে পারবে কিনা, সিওর ছিল না। অ্যানুয়ালের মাস দুয়েক আগে আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা। দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। দিন পনেরো বই নিয়ে বসতেই পারেনি। বন্ধুদের মধ্যে ওর অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ ছিল। হাত-পা কাঁপত, মাথা ঝিমঝিম করত।

বাবা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলেন। একসপ্তাহ টানা কাউন্সেলিং করতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টায় মানসিক বিপর্যয় থেকে বেরোতে পেরেছে রণিত। পড়ার চাপ তাতে সাহায্যই করেছে।

কিন্তু এখন গুছিয়ে বসে পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাতেই সেই ঘটনাটা এসে হাজির হল। গল্পে মন বসাতে খুব চেষ্টা করল রণিত। হল না। বারবার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ছটফট করতে-করতে উঠে পড়ল।

ড্রইংরুমে টিভি চলছে। কী হচ্ছে? মা দেখছে।

সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। রিয়্যালিটি গানের শো। সারা ভারত থেকে বাছাই করে নতুন গায়ক-গায়িকা হাজির করানো হয়েছে। তারা পরপর স্টেজে উঠে গান গেয়ে যাচ্ছে। একদিকে বিখ্যাত বিচারকরা কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে আছেন। মাথা দোলাচ্ছেন গানের তালে। শেষে প্রচুর হাততালি দর্শকদের। বিচারকরা নাম্বার দিচ্ছেন।

এখন সন্ধে গড়িয়ে গেলেই প্রায় সব চ্যানেলে এরকম শো। গান, নাচ। কোথাও আবার জোক্স, অ্যাকটিং। প্রচুর প্রাইজ মানি।

ভারতে যে এত প্রতিভা লুকিয়ে ছিল, জানা যায়নি আগে। এদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভালো গাইছে।

ফোন বেজে উঠল। ও ধরল।

—হ্যালো, রণিত? পিনাকী বলছি।

—হ্যাঁ, বল।

—কাল বারোটায় স্টেশনে মিট করছি। তুই, আমি. শৌভিক আর রূপ। শিয়ালদা থেকে নন্দন।

—সিনেমা?

—হ্যাঁ। 'চলো, লেটস গো'। বাংলা বই। একদম নাকি অন্যরকম। দিদিরা দেখে এসেছে। বলল।...ঠিক হ্যায়?

—ঠিক হ্যায়।

—র‍্যাম্বো মনে আছে তো? এগারোটায়।

—অবশ্যই। থ্যাঙ্কস।

দশটা বাজে। মা উঠে পড়ল। রান্নাঘরের দিকে এগোল। ফ্রিজ থেকে বের করে খাবার গরম করবে। ভাত বসাবে। বাবা একটু আগে চেম্বার থেকে ফিরেছেন। চান করে সোফায় এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।

—বাবা, র‍্যাম্বো দেখেছ?

—হ্যাঁ, স্ট্যালোন। অ্যাবসর্বিং মুভি।

—আজ মেগাটিভিতে এগারোটায় দেখাচ্ছে। দেখবে?

—নারে! পারব না। কাল ফার্স্ট আওয়ারে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ইম্পরট্যান্ট মামলা আছে। ন'টায় বেরিয়ে পড়তে হবে। তুই দ্যাখ। এনজয় কর।...

পৌনে এগারোটায় রিয়্যালিটি শো শেষ হয়ে গেল। খাওয়া শেষ। মা থালা তুলে উঠে পড়ল।

রণিত রিমোট নিয়ে সেন্টার টেবিলে পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসল।

প্রায় আরম্ভ থেকেই ঝড়। র‍্যাম্বো—সিলভেস্টার স্ট্যালোন। দেবদূতের মতো নিষ্পাপ, পবিত্র মুখ। শরীর যেন গ্রিক ভাস্কর্য। যখন অ্যাকশনে, তখন ক্রোধ কাঠিন্য ফুটে বেরোচ্ছে পেশিতে। অন্যসময় কোমল, মায়াবি।

চ্যানেলে সিনেমা দেখতে বসলে একটাই বিরক্তিকর ব্যাপার। পনেরো মিনিট পরপর বিজ্ঞাপনের বিরতি। যখন চরম রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত, কী হয়-কী হয়, ঠিক সেইসময় ইরফান পাঠান বাইক চড়ে হাজির। বাইকের বিজ্ঞাপন। বা শাহরুখ। কিংবা রঙের বিজ্ঞাপনে বচ্চন। মনোসংযোগ পুরো নষ্ট করে দেয়।

কোয়ার্টজ ক্লকে টুংটাং...বারোটা বাজল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। মফঃস্বল শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা-মার ঘর অন্ধকার।

আবার বিজ্ঞাপনের বিরতি চলছে। ঘুম-খুম পাচ্ছে রণিতের। বেসিনে গিয়ে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে এল। যত রাত হোক, পুরো সিনেমাটা দেখতে

হবে। কাল সকালে ওঠার কোনও তাড়া নেই।

টিভি জুড়ে স্ট্যালোনের মুখ। মুখের প্রতিটি পেশিতে ঢেউ খেলছে, তীক্ষ্ণ চোখ সতর্ক দৃষ্টি ফেলছে।

হঠাৎ—হঠাৎ—

রণিত শিউরে উঠল।

এ তো স্ট্যালোন নয়। পরদায় আর স্ট্যালোন নেই। তার বদলে...তার বদলে...

অসীম তাকিয়ে আছে।

অসীম? অসীম আসবে কোত্থেকে? ধ্যুৎ! মনের ভুল। হতেই পারে না।

চোখ মুছে তড়াক করে সোজা হয়ে বসল রণিত।

না—হ্যাঁ, এ তো অসীম! অসীমের মুখ।

সেই ফরসা টুলটুলে মুখে পরিচিত হাসি। একদৃষ্টে দেখছে রণিতকে।

কুলকুল করে ঘাম বেরুচ্ছে শরীর দিয়ে। কী দেখছে ও? অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।

তাড়াতাড়ি রিমোট নিয়ে চ্যানেল পালটে দিল।

এ কী! এখানেও অসীম!

পাগলের মতো পটপট করে চ্যানেল পালটাচ্ছে রণিত।

সব চ্যানেলের সব প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে? অসীম! সবখানেই অসীম।

অসীমের ছবি এবার আর স্থির নয়। অসীম হাসছে। হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে রণিত।

—কীরে রণিত, আমায় আর দেখতে চাইছিস না?

অসীম কথা বলছে? হাত-পা জমে যাচ্ছে রণিতের। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

—আমি না তোর বেস্ট ফ্রেন্ড? সবাই তো সেরকমই জানে। বন্ধুকে দেখে খুশি হচ্ছিস না?

রণিত পাথরের মতো নিথর!

—আমার যে তোকে ভীষণ দরকার বন্ধু। পরীক্ষা চলছিল বলে

তোকে বলতে আসিনি। এমনিতে তুই যা ভেঙে পড়েছিলি! সবসময় কাঁদতিস, পড়তে পারতিস না। সবটাই আমার জন্যে। আমি শুধু দেখেছি, কষ্ট পেয়েছি। কিছু করার ছিল না।

রণিতের দু-চোখ বিস্ফারিত, বাকশক্তিরহিত।

—কীরে, কথা বল? অ্যাই রণিত, আমায় ভয় পাচ্ছিস কেন রে? তোর বন্ধুত্বের টানই তো ফিরিয়ে এনেছে আমাকে। যেতে গিয়েও যেতে পারছি না। তুই আমায় একটু হেল্প করবি না রণিত? একটু হেল্প? কীরে, বল?

—আ-আমি...ত্‌-তোকে...ত্‌-তুই...

—হ্যাঁ, আমি আর বেঁচে নেই রে। আমার কোনও শরীর নেই। সেইজন্যেই আমি কিছু করতে পারছি না। তোকে চাইছি। তুই আমায় ভয় পাচ্ছিস! প্লিজ, রণিত, একটু হেল্প কর।

—হ্‌-হেল্প?

—হ্যাঁ, হেল্প। তাহলেই সত্যিটা প্রকাশ পাবে। সেদিন কী ঘটেছিল, কেউ জানে না। সবাই জানে, পুকুরে ডুবে আমি আত্মহত্যা করেছি।

—ত্‌-তুই সুইসাইড করিসনি?

—নাঃ! কেন করব? শেষপর্যন্ত তোর সঙ্গেই তো ছিলাম। মনে নেই? মিশন থেকে বেরিয়ে মিশনপাড়া দিয়ে দুজনে হাঁটছিলাম। গল্প করতে-করতে।

—হ্যাঁ।...মনে আছে। হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এল। ঝড় উঠল।

—ঠিক বলেছিস। কালবৈশাখী। তারপরেই শুরু হল বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। তুই বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে ছুট দিলি। ছুটতে-ছুটতে বললি, 'কাল স্কুলে দেখা হবে, টা-টা'। মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—তোর বাড়ি কাছে। মিশনপাড়ার শেষে। আমার বাড়ি সেই উত্তরপাড়া। অনেকখানি দূর। ভাবলাম, কাছে কাকুর বাড়ি। সেখানে একটু ওয়েট করে যাই। বৃষ্টি ধরলে বাড়ি ফিরব। ওখান থেকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেব।

—কাকু মানে রামুকাকু?

—হ্যাঁ। কাকুর বাড়ি ঢুকতে গিয়ে থমকে গেলাম। বাইরে একটা কালো বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ভিতরে অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, বসার ঘরে কয়েকজন ষণ্ডামতন লোক কাকুর সঙ্গে কথা বলছে। টেবিলের ওপর একটা সুটকেসে অনেক-অনেক টাকা ভর্তি! কালো, মোটা একজন হঠাৎ কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে বলল, 'তুমি ও নিয়ে ভেবো না, রামুদা। একটু বেচাল করলেই চালিয়ে দেব। খাল্‌লাস।' পিস্তল দেখে আমি আঁতকে উঠেছি। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে গেছে। অমনি—

—অমনি?

—অমনি ওরা মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'কে-কেরে'? আমি কী করব, বুঝতে না পেরে ছুটে পালাতে গেছি। বারান্দাটা জলে ছপছপ করছিল। পিছলে পড়ে গেলাম। ওঠার আগেই ওরা বেরিয়ে এসে আমায় ধরে ফেলল।

—তারপর...?

—কাকু বারবার কাকুতিমিনতি করছিল, 'ওকে ছেড়ে দাও। ও কাউকে কিচ্ছু বলবে না। ও আমার একমাত্র ভাইপো।' ওদের সর্দার মোটাটা উড়িয়ে দিল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রামুদা? সাক্ষীর শেষ রাখতে নেই। তুমি নিজে মরবে, আমাদেরও মারবে!'

—তারপর...?

—আর শুনে কী করবি, রণিত? তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সন্ধে হয়ে গেছিল। রাস্তাঘাটে একটাও লোক ছিল না। চ্যাংদোলা করে ওরা আমায় টানতে-টানতে নিয়ে গেল মিশনের পুকুরে।...উঃ, জলে দম আটকে মরতে কী কষ্ট রে! উঃ, এতটকু বাতাসের জন্যে খাবি খাচ্ছিলাম...ওরা আমায় জলে ঠেসে ধরছিল...

—ত্‌-তুই থাম! আর শুনতে পারছি না।

—এইজন্যেই তো এতদিন আসিনি। তোকে বলিনি। তুই এত ভেঙে পড়েছিলি! আগে জানলে তুই পরীক্ষাই দিতে পারতিস না।

দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে রণিত। কান্নার প্রবল বেগ ঠেলে আসছে বুক থেকে। আবার, আবার সেই ছবিটা ভেসে উঠেছে! অসীমের জলে

ডোবা ফুলো-ফুলো নিস্পন্দ শরীর খাটে শোয়ানো। ওর মা আছাড়িপিছাড়ি কাঁদছেন।

—শোন রণিত, কাঁদিস না রে। কেঁদে কী লাভ? আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। শুধু একটা কাজ কর ভাই। ওদের মুখোশ খুলে দে। সত্যিটা সবাই জানুক।

—কী করতে হবে?

—কাল সকালেই তুই মেসোমশাইকে নিয়ে থানায় গিয়ে এই ঘটনাটা বল! কাকুকে পুলিশ কড়া করে জেরা করলেই সব বলে ফেলবে। আমি সিওর, কাকু কোনও খারাপ দলের সঙ্গে যুক্ত। অত টাকা... পিস্তল...অতগুলো খুনি, গুন্ডা...আমি চাই সবক'টা ধরা পড়ুক। তবেই আমার শান্তি হবে।

—যাব, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু পুলিশ কী আমার কথা বিশ্বাস করবে?

—করবে। বলবি, যদি মিথ্যে হয়, তুই দায়ী থাকবি। আমি মারা যাওয়ার পরে তোকে তো অনেকবার থানায় ডেকেছিল। ডাকে নি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে? সবাই জানে, তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রাণের বন্ধু। তুই আমার সব জানিস।

যন্ত্রের মতো ঘাড় নাড়ল রণিত।

—চলি রে। আর বোধহয় দেখা হবে না। এই কথাগুলো বলার জন্যেই আমায় আটকে থাকতে হয়েছিল।...

—বাবিন, ন'টা বাজে। আমি বেরোচ্ছি। উঠবি না?

রণিত ধড়মড় করে উঠে বসল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। সামনে বাবা। হাসছেন।

—বাব্বা! রাম্বো দেখতে-দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলি! টিভিটাও বন্ধ করতে পারিসনি। মা সকালে সুইচ অফ করেছে। তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।

—বাবা! বাবা! তোমায় এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—যেতে হবে? কোথায়?

—থানায়।

—থানায়? কী বলছিস পাগলের মতো? আমি এখনই কোর্টে বেরোচ্ছি।

—না, বাবা। তোমায় যেতেই হবে। আমি একা গেলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি, প্লিজ, জানিয়ে দাও, কোর্টে যেতে তোমার দেরি হবে। প্লিজ বাবা!

বলতে-বলতে রণিত আঁকড়ে ধরল বাবাকে।

—আরে! কী হয়েছে, বলবি তো?

—বলব, সব বলব। তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। অসীম সুইসাইড করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে। থানায় গিয়ে এটা আমায় বলতেই হবে।
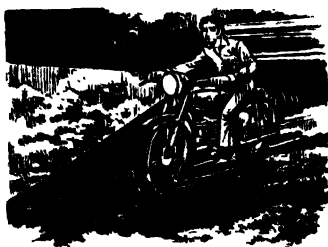
ছায়াময়ী

ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। খানিকটা আগে চৌকিদার ঢাকা দেওয়া হ্যারিকেন হাতে, আমার হাতে চারসেলের টর্চ, পিছনে দুটো কনস্টেবল।

দুপাশে ধূ-ধূ ধানি জমি। এবড়োখেবড়ো আলপথ, মারাত্মক পিছল। একটু অসাবধান হলেই কাদায় গড়াগড়ি।

চৌকিদারকে বললাম—কী রে, আর কদ্দূর?

—হুই...যে।

হ্যাঁ, টিমটিমে একটা আলো এতক্ষণে দেখা যাচ্ছে বটে। যাক, এবার তাহলে এসে গেছি।

যে সময়ের কথা, তখন মেদিনীপুর জেলায় ওইসব এলাকা যে কী

দুর্গম ছিল, তোমরা ভাবতেই পারবে না। আমি সবে জয়েন করেছি সুতাহাটা থানায়। সেকেন্ড অফিসার। বাহন বলতে একমাত্র সাইকেল। তাও শুকনোর সময়ে। বর্ষাকালে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। থানার এলাকা ছিল বিরাট। সে তুলনায় পুলিশ ফোর্স খুবই কম। কোথাও বড় গোলমাল বাধলে রিজার্ভ ফোর্স পাঠাতে খবর পাঠাতে হতো এস.পি. মানে বড়সায়েবকে।

বুঝতেই পারছো, পুলিশের চাকরি সে সময় কেমন ছিল! থানায় পোস্টিং মানে, চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। এমনও হয়েছে, পরপর তিন রাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

সেদিন বিকেলে একটা মার্ডার কেসের তদন্ত সেরে সবে কোয়ার্টারে ফিরেছি। থানা থেকে খবর দিল, শিবরামপুর থেকে চৌকিদার এসেছে!

কোনওক্রমে নাকে মুখে দুটো গুঁজে ছুটলাম। চৌকিদারের কাছ থেকে জানা গেল, বিশ্বাস বাড়ির বড় বউ গলায় দড়ি দিয়েছে। বাড়ির লোক দেহ সৎকার করতে চাইছিল, চৌকিদার আটকে দিয়েছে।

—এখন বডি কোথায়?

—ঝুলছে ছার। হাত দিতে দিইনি।

—বেশ করেছিস। চল।

সন্ধের মুখে রওনা হয়েছি। এখন প্রায় আটটা বাজে। চৌকিদার সামনে হাঁটছে। পিছনে দুটো সেপাই। মাইল পাঁচেক কোনও রাস্তা নেই। আলপথ ধরে আন্দাজে এগোতে হয়েছে।

শিবরামপুর মোটামুটি বড় গ্রাম। এখন অবশ্য ফাঁকা। পুলিশের সাড়া পেয়ে সব ছুট্-ছুট্ করে বাড়িতে ঢুকে গেছে। দরজা বন্ধ প্রায় সব বাড়ির। বিশ্বাস বাড়ির ক'জন শুধু দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের দেখেই বয়স্কা এক মহিলা হাউমাউ করে উঠল,—হুজুর, আমরা কিচ্ছু জানি না। বিশ্বেস করেন, কাল রেতেও মালতী ঘরদোরের কামকাজ ঠিকঠাক করিছে...!

—আপনি কে হন?

—আমি ওর শাউড়ি।

—আপনার ছেলে কোথায়?

—হুজুর, বড় ছেলে মানে মালতীর সোয়ামি আবাদে গেছে জন খাটতে। মেজ আর ছোট এখানেই ছিল। সকালে পালিয়ে গেছে।

—পালিয়ে গেছে! কেন?

—হুজুর আপনাদের...মানে...পুলিশের ভয়ে। সত্যি বলছি হুজুর, কী করে যে কী ঘটে গেল বুঝতে পারতেছি না। বাড়িয়ে বলতেছি না হুজুর, বড্ড ভালো মেয়েছেলে মালতী। এই দেখুন, ওর দু-দুটো দুধের বাচ্চা। বাড়িতে আর মেয়েছেলে নেই! বড় ছেলেরই খালি বিয়ে হইছিল। মেজটার এই অঘ্রাণে—

—এরা কারা?

—হুজুর, এ আমার বড় মেয়ে, জামাই। কাছের গেরামে বিয়ে হইয়েছে। খবর পেয়ে চলে এয়েছে। আর ইনি মেয়ের শ্বউর-শাউড়ি, বেয়াই-বেয়ান।

—বড় বউয়ের বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছেন?

—মালতীর বাপের বাড়ি অনেকদূর, হুজুর! রামনগরের কাছে। আজ্জ সকাল থেকে যা অবস্থা হচ্ছে, ভেবেছিলাম আজ সৎকার করে কাল সকালে ছেলেদের...হায় রে, কেন এমন করলি রে মালতী! ওরে, তোর কী দুঃখ ছেল রে মনে—

—শুনুন, বডি আমরা নিয়ে যাব। আত্মহত্যা অপঘাত মৃত্যু, বোঝেন তো! না-না, কেঁদে কোনও লাভ নেই, পুলিশের কাজ আমাদের করতে হবে। কাল সকালে বড় বউয়ের বাপের বাড়ি খবর পাঠাবেন। ওর বাবা-মাকে থানায় দেখা করতে বলবেন। আর আপনার ছেলেদের বলবেন, নিজেদের ভালো যদি চায়, থানায় আসতে।...পরাণ, বডি নামাও। চৌকিদার কোথায় গেল?

—ছ্যার, ভ্যান আনতে গেছে।

এই পর্যন্ত একটানা বলে অরুণ রায়মুখার্জী চুপ করলেন। এষা বলে উঠল,—তাতাই, ভূত আছে তো?

অরুণবাবু মুচকি হাসলেন,—দিদিভাই, ভূত কিনা জানি না। তবে এটা গল্প না, আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

অন্বেষা লাফিয়ে উঠল,—না তাতাই, ভূতের গল্প চাই।

দিদিসোনা, ভূতের গল্প আমি জানি না।—অরুণবাবু বললেন, পুলিশে কাজ করতে গিয়ে যেসব অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি, সেগুলোই তোমাদের বলি। এটা তেমনই একটা ঘটনা।

বাবলু বলল,—মেসোমশাই, আপনার চা জুড়িয়ে গেল!

—হ্যাঁ, খাচ্ছি। আগে এক গ্লাস জল দাও।

এক নিঃশ্বাসে জল শেষ করে চায়ে চুমুক দিলেন অরুণবাবু। গরম বেগুনিতে বড় কামড় মেরে বললেন,—ভূতে আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু নিজের চোখে যেসব দেখেছি, সেগুলো আর যাই হোক চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ববি বলল,—তার মানে এখন আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

—এই ঘটনাটার শেষটুকু শোন। আসলে আমার মনে হয়, মানুষ যন্ত্র না। হার্ট যন্ত্র বন্ধ হল, মানুষ মরে গেল, সবকিছু শেষ—এই বিশ্বাস আমার মনে হয় ঠিক নয়।

অরুণবাবু, আপনি আগে খেয়ে নিন।—রান্নাঘর থেকে এবার ঠাকুমা বললেন,—বেগুনি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে! চুমকি, এই থালাটা নিয়ে যাও।

রবিবার। বিকেল। শ্রাবণের জল ঝরছে সেই সকাল থেকে। কোথাও বেরোবার ব্যাপার নেই। আড্ডা তাই জমজমাট। আর অরুণ রায়মুখার্জি যেখানে হাজির, সেখানে বাকি সবাই শ্রোতা। কতরকমের অভিজ্ঞতা যে ভদ্রলোকের।

খাওয়ার পাট শেষ হল। বাবলু একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। সিগারেটে টান দিয়ে অরুণবাবু বলতে শুরু করলেন।

লাশ নামিয়ে ভ্যানে তুলে ফিরতি পথে রওনা হলাম। চৌকিদারকে বলে এলাম, কাল সকালে বিশ্বাসবাড়ির ছেলেদের থানায় হাজির করাতে।

আলপথ দিয়ে সাইকেল ভ্যান চালানো যে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম, বোঝানো অসম্ভব। শবদেহের উপর তেরপল চাপিয়ে সামনে টানছে চালক, পিছনে প্রাণপণে ঠেলছে দুই সেপাই।

বৃষ্টি ধরে গেছে। মেঘ কেটে গিয়ে হলদে চাঁদ উঠেছে। ধানক্ষেতে

অবিরাম ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির কানে তালা ধরানো শব্দ। জোনাকিও উঁকি ঝুঁকি মারছে ঝোপেঝাড়ে।

রাত ঝিমঝিম করছে। দু-ধারের জলেডোবা ধানক্ষেত, পুকুর-বিল ধুয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়।

পিছনে ওরা আসছে। একের পর এক সিগারেটে টান দিতে-দিতে আমি সামনে। মাথায় নানারকম চিন্তা ভেসে যাচ্ছে, ওই মহিলার কথাবার্তা একটু অসংলগ্ন লাগছে না? বড় ছেলে আবাদে কাজ করতে গেছে, বাকি দুই ভাই এখানে। তারা পালাল কেন? বউটা আত্মহত্যা করল কেন? কী কষ্ট? দুটো বাচ্চা আছে। শাশুড়ি বলছে, কাল রাতেও সব ঠিকঠাক চলেছে...কোনও গাঁয়ের লোককে পাওয়া গেল না! দেওর, শাশুড়ি অত্যাচার করেনি তো? তাই বা করবে কেন? বড় ছেলে বউ-বাচ্চা রেখে বেশি আয় করতে আবাদে গেছে। তার টাকাতেই সংসার চলে! তবে?...

ভাবছি আর ভাবছি।

কাল সকালে পোস্ট মর্টেমের জন্যে বডি পাঠাতে হবে মেদিনীপুর জেলা শহরে। ওখান থেকে রিপোর্ট পেতে-পেতে আরও দু-দিন। যা কিছু করণীয় তারপর।

শরীর আর চলছে না। তারই বা দোষ কী! আজ ভোর থেকে ঝড় বইছে। সেই কোন ভোরে ছোটা শুরু হয়েছে। এখন কোয়ার্টারে ফিরে একটু টান হতে পারলে, আঃ কী আরাম!

থানার বড়বাবু মানুষটা খুব ভালো। উনি আসতে চেয়েছিলেন। আমিই দিইনি। বয়স্ক, সংসারী মানুষ। থানায় সাব ইন্সপেক্টর দুজন, ও.সি. ও আমি। তাই এ ধরনের অপঘাত মৃত্যুর কেসে নিয়ম অনুযায়ী যে-কোনও একজনকে আই.ও. অর্থাৎ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হিসেবে যেতেই হবে।

থানায় ফিরতে-ফিরতে রাত বারোটা। ডায়েরি, কেস রিপোর্ট লিখে বড়বাবুকে সংক্ষেপে জানিয়ে কোয়ার্টারে যখন ফিরলাম ঘড়ির কাঁটা একটা ছুঁই-ছুঁই।

ডেডবডি ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে থানার লাগোয়া আস্তাবলে। বাকি দুজন সিপাইকে পোস্টিং করে দিয়ে এসেছি। তারা রাত জেগে ডেডবডি

পাহারা দেবে। আস্তাবলের কোনও দরজা নেই!

আস্তাবল কেন তাতাই? তোমাদের থানায় ঘোড়া ছিল?—এষা বলে উঠল।

—ব্রিটিশ আমলে ছিল। তখন ঘোড়াই একমাত্র বাহন। সেইসময় বানানো হয়েছিল।—অরুণবাবু বললেন, পরবর্তীকালে সাইকেল, জিপ, মোটরসাইকেল। সব ওই আস্তাবলে থাকত। ওটাই কমন গ্যারাজ আমি যখনকার কথা বলছি, তখন সুতাহাটা থানায় পুলিশের ভেহিকল বলতে একটা মাত্র জিপ আর খানকতক সাইকেল।

পাহারা দিতে বলে এলেন কেন?—বাবলু বলল, আস্তাবল তো থানা ক্যাম্পাসের মধ্যেই।

—ক্যাম্পাসের মধ্যে হলেও থানার পাঁচিল ভাঙা-চোরা। যখন-তখন শেয়াল কুকুর ঢুকে পড়ে।

—আপনাদের কোয়ার্টার থানা থেকে কতদূরে?

—থানার মধ্যে। একই ক্যাম্পাসে। ও.সি., সেকেন্ড অফিসার এই দুজনের কোয়ার্টার। বাকিরা লোকাল লোক, দু-চারমাইল এদিক-ওদিক থেকে ডিউটি করতে আসত। আমাদের কোয়ার্টার দুটো ছিল থানার ব্যাকসাইডে। আমাদের বেরোতে হতো থানার গেট দিয়ে।

হ্যাঁ, যেখান থেকে বলছিলাম, কোয়ার্টারে ফিরে দেখি, কাজের মাসি রান্না করে ভাত ঢাকা দিয়ে চলে গেছে। তখন আমি একা লোক। ওই মাসি বড়বাবুর বাড়িতে ফুলটাইম কাজ করে। আমার রান্নাবান্না, টুকিটাকি কাজ পার্টটাইম করে।

শরীর-মন বিছানার দিকে চুম্বকের মতো টানছে। সর্বাঙ্গ অবশ, কতক্ষণে শোব। তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে বিছানায় লম্বা হলাম। শুতে-না-শুতেই গভীর ঘুম!

কতক্ষণ কেটেছে জানি না। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ আমার নাকে ভেসে এল মিষ্টি গন্ধ। অনেকটা ওডিকোলনের মতো।

অমি কোলবালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে শুলাম।

আবার গন্ধ! একেবারে কাছে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে। অতিকষ্টে চোখ ফাঁক করলাম। ঘরের

মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো। আর...আর একটা ছায়া! জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে-কে? পাশ ফিরে তড়াক করে উঠে বসেছি।

একটা অল্পবয়েসি বউ। মুখখানা ভারি মিষ্টি। ঢলঢলে। মাথায় আধখানা ঘোমটা। আমায় উঠতে দেখে ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে গেছে।

ততক্ষণে মাথার বালিশের নীচে থেকে টর্চ আর রিভলভার আমার হাতে উঠে বসেছে।

—কে, কে আপনি?

বউটি নিরুত্তর। মনে হল, মুখ টিপে একটু হাসল। তারপর হাঁটা দিল ডানদিকে।

ব্যাপারটা কী? এতরাতে অল্পবয়েসি বউ থানার মধ্যে। এই ক্যাম্পাসে একমাত্র মহিলা বড়বাবুর বউ। আমার বউদি। আর থাকে কাজের মাসি। সেও থাকে বড়বাবুর কোয়ার্টারে। তবে কি কোনও অসামাজিক উদ্দেশ্যে থানার মধ্যে...আমার কাছে কেন? খবর পেয়েছে আমি ব্যাচেলার? ছিঃ ছিঃ! বদনাম হয়ে যাবে।

রাগে আমার গা জ্বলতে থাকল। ঘুম-টুম উধাও।

মহিলা গেল ডানদিকে। মানে থানার দিকে। ওখানে গেল কেন? আজ রাতে থানার ডিউটি অফিসার এ.এস.আই. শেখর আর একটা আর্মড গার্ড। আস্তাবলে ওই দুটো সেপাই। শেখরের আবার এইসব দোষটোষ...

তাড়াতাড়ি জামাটা গলিয়ে, লুঙির ওপর রিভলভার গুঁজে, টর্চ নিয়ে আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছি।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। আমি হনহন করে হাঁটছি। নাহ্! কোথাও কেউ নেই।

থানার গেটে টুলে ঢুলছিল রাইফেলধারী গার্ড। আমার পায়ের শব্দে ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল। ভিতরে একা শেখর টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। একবার ডাকতেই উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকল,—স্যার!

—এসো আমার সঙ্গে।

আশ্চর্য! এদিকেই এসেছিল অল্পবয়েসি বউটা। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কী করে?

শেখরকে নিয়ে দুজনে থানার দক্ষিণদিকে এগোলাম। থানার পরেই আস্তাবল।

একটু এগোতেই,—খ্যাক-খুয়া...খুয়া...খুয়া—য়া...

আমাদের চক্ষুস্থির! আস্তাবলের বাইরে দুই সিপাই মড়ারমতো ঘুমোচ্ছে। পাঁচিলের ফোকর দিয়ে ঢুকে চার-পাঁচটা শেয়াল মহানন্দে টানাটানি শুরু করেছে লাশটাকে নিয়ে। অনেকখানি নামিয়েও এনেছে। পায়ে শব্দ শুনে লেজ তুলে দৌড়োল।

হারামজাদা! রাগে আপাদমস্তক রি-রি করে উঠেছে আমার। প্রচণ্ড জোরে দুটোকেই লাথি কষালাম।

হাউমাউ করে উঠে দুটোই পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল! এবারের মতো মাপ করে দিন ছ্যার! আর হবে না! ছ্যার, এবারের মতো...

কিন্তু ততক্ষণে আমার রাগ উধাও। শরীর দিয়ে বরফঠান্ডা স্রোত বইতে শুরু করছে।

চোখের সামনে এ কী দেখছি?

শেয়ালের টানাটানিতে শবদেহ বেঁকেচুরে গেছে। সরে গেছে তেরপলের ঢাকনাও।

একঢাল চুলের মধ্যে একখানা ভারি মিষ্টি মুখ। জোৎস্নার ফুটফুটে আলোয় স্পষ্ট। আরও স্পষ্ট একটু আগে একেই আমি দেখেছি আমার জানলায়।

নাকে ভেসে এল ওডিকোলনের গন্ধ।...

অরুণবাবু থামলেন।

বাবলু আস্তে-আস্তে বলল—আপনাকে জানাতে এসেছিল?

—তেমনই মনে হয়। সে রাতে যদি লাশ টেনে নিয়ে যেত শিয়ালে, আমার কপালে গভীর দুঃখ ছিল। থানার ডায়েরিতে কেস এন্ট্রি হয়েছে। প্রাইমাফেসি তদন্ত হয়েছে। গ্রামের লোক কি ছাড়ত? তখন উলটে যেত সব। সিপাই দুটো তো বরখাস্ত হতোই, হয়তো সাসপেন্ড হতে হতো আমাকেও। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—তাছাড়া কেসটা যে আদৌ সুইসাইড নয়, সেটাও কোনওদিন জানতে পারতাম না।

—সুইসাইড নয়?

—না। মার্ডার। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানিয়েছিল, গলা টিপে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—দোষী ধরা পড়ল?

—নিশ্চয়ই। মেজভাই। পুলিশি জেরা ও ডান্ডা খেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল। অবস্য ওর হাতের ছাপও পাওয়া গেল গলায়। সেও ফরেনসিক হল।

—কিন্তু কারণটা কী?

—বউদির প্রতি কুনজর। শাশুড়ি ছেলের পক্ষে। তার কথা হল, তোর সোয়ামি এখানে নেই, দেওর যদি একটু আমোদ আহ্লাদ করে, তো দোষ কী! বউ রাজি নয়। এই নিয়ে রাগারাগি, চুলোচুলি...চিৎকার... তারপর...!

এষা বলল,—তাতাই, আরেকটা।

—আর এক দিন। সন্ধে হয়ে গেছে, বৃষ্টিও থেমেছে। আজ উঠি।

দেখা হয়ে গেল

সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপ্‌রে বাপ!

এ সেই সময়ের কথা। ১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পূবদিকে। দুটো জোট তৈরি হয়েছে—মিত্রশক্তি আর অক্ষশক্তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে অক্ষশক্তি জাপান মরিয়া। তারা প্লেন থেকে বোমা ফেলে গেল খিদিরপুর ডকে।

কলকাতায় ত্রাহি-ত্রাহি রব। মানুষ ইঁদুরের মতো পিলপিল করে পালাচ্ছে শহর ছেড়ে। যা পরিস্থিতি, যে-কোনও সময় জাপানি বোমায় গোটা

শহর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে!

আমরা তখন কলকাতায় পড়াশুনো করি। বাবার পুলিশের চাকরি। সে সময় উনি খুলনায় পোস্টেড। খবর পেয়ে উনি ছুটে এলেন। ভাড়াবাড়িতে তালা ঝুলিয়ে উনি মা-ভাইবোন আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন বহরমপুরের আদি বাড়িতে।

মুর্শিদাবাদে আমাদের জমিদারি ছিল। খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই, কাকা-জ্যাঠা, কাকিমা-জেঠিমা সবাই বহরমপুরে থাকেন। কাদাইতে বিরাট সাতমহলা বাড়ি। ঠাকুমা বেঁচে। ঠাকুরদা কিছুদিন হল মারা গেছেন।

বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় বড়রা। কেউ জানে না, আগামী দিনে কী ঘটতে চলেছে। তবে আমাদের দারুণ মজা। সব মিলিয়ে বত্রিশটা ছেলেমেয়ে। একসঙ্গে, এক বাড়িতে। সারাক্ষণ খেলাধুলো, হই-চই। বিশাল অট্টালিকা গমগম করছে।

বাবার মতো বড়জ্যাঠা আর বড়কাকার বাইরে-বাইরে চাকরি। কলকাতায় থাকত তাঁদের পরিবার। সেই দাদা-দিদি-ভাই-বোনেরাও এর আগে খুব বেশি বহরমপুরে আসেনি। তাই দিন পনেরো যেতে-না-যেতেই আমাদের সকলের আবদার শুরু হয়ে গেল; এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। আমরা দেখব।

ঠাকুমা যেমন হন, সর্বংসহা। আদরের নাতিনাতনিরা সব্বাই এতকাল পরে একজায়গায় এসেছে। তাদের আবদার না রাখলে চলে! আমাদের পোয়াবারো। দলবেঁধে কোনদিন হাজারদুয়ারি, কোনদিন মীরজাফরের দেউড়িতে...ঠিক যেন পিকনিক চলছে আমাদের।

কলকাতায় থাকতে শুনেছি, আমাদের নাকি পৈর্তৃক বিরাট জমিদারি আছে গঙ্গার অপর পারে। জায়গাটার নাম ভারি সুন্দর। আঁধারমানিক। সেখানে কাছারি বাড়ি আছে। সে নাকি বিরাট ব্যাপার। কাকা-জ্যাঠা মাসে একবার করে যান। হিসেবপত্র দেখতে। আর জমিদারি থেকে প্রতি সপ্তাহের সোমবার গোমস্তাবাবু আসতেন। ঠাকুমাকে হিসেব করে টাকাকড়ি দিয়ে যেতেন।

গতকালও যথারীতি এসেছিলেন। রতন আর আমি তখন ঠাকুমার পালঙ্ক খাটে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে তেঁতুলের আচার খাচ্ছি। ঠাকুমা

যা আচার বানায় না! অমৃত!

হঠাৎ রতন বলল,—অরুণ, যাবি নাকি?

আমি টাকরায় টক-টক শব্দ করে বললাম,—কোথায় রে? সব তো দেখা হয়ে গেছে।

—দূর হাঁদা! আমাদের জমিদারি দেখেছিস?

আমি আচারের বাটি হাতে উঠে বসলাম,—আমাদের জমিদারি? মানে গঙ্গার ওপারে? সে তো অনেক দূর রে!

ধ্যাৎ!—রতন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী,—দূর কোথায়? ঠাম্মার কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছি। এই তো গোরাবাজারের ঘাট থেকে খেয়া ছাড়ে। ওপারে পৌঁছে মাইলখানেক সিধে হাঁটলেই আঁধারমানিক। তুই যাবি কিনা বল।

—আরে! আমি তো রাজি। বড়রা কি ছাড়বে আমাদের?

—সেটা ম্যানেজ করতে হবে। ঠাম্মাকে ধরে ঝুলে পড়তে হবে। ঠিকমতো বাগাতে পারলে ম্যানেজ হয়ে যাবে। ওঠ্, ওঠ্! এখনি ধরতে হবে বুড়িকে।

রতন আমার খুড়তুতো ভাই। বড়কাকার ছেলে। আমার চেয়ে মাত্র দু-মাসের ছোট। তাই ভাইয়ের চেয়ে বন্ধু বলাই ঠিক। বহরমপুরে আসা অব্দি সারাক্ষণ দুজনে একসঙ্গেই নাওয়া-খাওয়া, ওঠা-বসা।

গোমস্তাবাবুর সামনেই দুজনে জাপটে ধরলাম ঠাম্মাকে। প্রথমে কিছুতেই অনুমতি মেলে না। একনাগাড়ে ঘ্যানঘ্যান করতে-করতে শেষপর্যন্ত বরফ গলল।

ঠাকুমা বললেন,—ঠিক আছে। শোন, সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যাবি। ওপারে গোমস্তাবাবুর লোক থাকবে। সে-ই তোদের নিয়ে যাবে। ওখান থেকে খেয়েদেয়ে বেলাবেলি বেরিয়ে পড়বি। সন্ধের আগেই বাড়ি ঢুকতে হবে। ঠিক আছে?

আমরা দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় নাড়ি। মনের মধ্যে তখন ফুর্তির ঢেউ। কী মজা! এই প্রথম দুজনে, শুধু দুজনে বেড়াতে যাব নিজেদের জমিদারিতে।

রাতে উত্তেজনায় ভালো করে ঘুম হল না। ভোর হতে-না-হতেই

দুজনে উঠে পড়লাম। সাড়ে আটটার মধ্যে চা-জলখাবার খেয়ে, চান-টান করে রেডি।

বেরোবার আগে ঠাকুমা ফের বললেন,—শোন। যা বলেছি মনে থাকে যেন। তোমাদের মা-জেঠিমার অমতে আমি ছাড়ছি। আমার মুখ কালো করিসনি বাপু।

আমরা তখন হাঁটছি না, প্রায় দৌড়চ্ছি। ওঃ, দুই বন্ধুতে মিলে বেড়ানোর মজা কী!

গোরাবাজারের ঘাট থেকে খেয়া ছাড়ল। ওপারে নেমে দেখি, গোমস্তাবাবু নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পিছুপিছু আমরা হাঁটলাম আঁধারমানিকের দিকে।

মাঝে বেশ খানিকটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দুপাশে ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছ। কোনও গ্রাম নেই।

প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর ধানখেত শুরু হল। দূরে-দূরে সব ছোট-ছোট কুঁড়েঘর, ধানের গোলা। গোমস্তাবাবু বললেন,—জঙ্গলের পর থেকে আমাদের জমিদারির সীমানা।

আমরা দেখতে-দেখতে চলেছি। শীতের শুরু। মিঠে রোদ্দুর, ফুরফুরে হাওয়া।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে জমিদারির কাছারিবাড়ি। একতলা পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোনে ধানের স্তূপ। একটু দূরে টলটলে বড় পুকুর। প্রায় দিঘির মতো। এককোণে দুটো দুই চাকা গরুর গাড়ি। একটা তেল চকচকে ঘোড়াও বাঁধা আছে।

যত দেখছি, তত রোমাঞ্চিত হচ্ছি। এই স-ব আমাদের। আমরা মালিক!

কাছারিবাড়ির কাছাকাছি আসতে দু-তিনজন ছুটে এল। এরা সব সেরেস্তায় কাজ করে। তারপর কী যে খাতিরযত্ন, যে বলার নয়। প্রথমে ডাবের জল, মুড়ি-নারকেল-বেগুনি। তারপর দুপুরের খাওয়া...ওঃ, এলাহি ব্যাপার। পুকুরের তিন-চাররকম টাটকা মাছ, মুড়িঘন্ট, চাটনি, দই। খাওয়ার আগে গোমস্তাবাবুর সঙ্গে আমরা জমিদারি দেখতেও বেরিয়েছিলাম। সবটা দেখা সম্ভব নয়, তবুও অনেকগুলো গ্রামে গেছি। যেখানেই গেছি, বয়স্ক

বয়স্ক মানুষজন আমাদের সামনে হাতজোড় করছেন, মাথা নুইয়ে পেন্নাম করছেন। সে ভারি অস্বস্তি! গোমস্তাবাবু বলেছেন, এটাই নাকি নিয়ম। জমিদার রাজার সমান, এরা সব প্রজা। তার উপর জাতে আমরা আবার বামুন।

খাওয়ার পর শরীর ছেড়ে দিল। দুটো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়েছি, ব্যস! নিমেষে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল।

ওঠো, ওঠো। তোমাদের ফিরতে হবে।—গোমস্তাবাবুর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বাইরে সূর্য বেশ খানিকটা পশ্চিমে সরে গেছে।

—চলো। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, না, কোনও দরকার নেই।—রতন সবেগে মাথা নেড়ে বলল, সোজা পথ। চলে যেতে পারব।

না বাবা।—গোমস্তাবাবু বললেন,—কত্তামা বলে দিয়েছেন। আমি বিপদে পড়ে যাব।

আপনি শুধুমুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।—রতন গোমস্তাবাবুর হাত ধরে বলল, ঠাম্মাকে আমরা বুঝিয়ে বলব। কোনও চিন্তা করবেন না। দুজন আছি, ঠিক পৌঁছে যাব।

অনেকক্ষণ বলার পরে শেষপর্যন্ত গোমস্তাবাবু নিমরাজি হলেন। ডাব খেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

তাড়াতাড়ি হাঁটছি। কথায় কথায় সূর্য আরো পশ্চিমে চলে গেছে। ধানক্ষেত পেরিয়ে এসেছি। এবারে জঙ্গল শুরু হচ্ছে। এরপরেই গঙ্গার ঘাট।

রতন বলল,—আমাদের বাঁ-দিক ধরে চলতে হবে। যেখানেই পথ ভাগ হয়েছে, বাঁয়ের পথ ধরব। কী রে, তাই তো?

আমি একটু ভেবে বললাম,—তাই তো হওয়া উচিত। আসার সময় বরাবর ডানদিক ধরেছি, এবার উলটো হবে। শেষ খেয়া ক'টায় রে?

—ছ'টায়। অনেক দেরি।

জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছ, ঝোপঝাড়। ডালে ডালে পাখিদের কিচিরমিচির। এখানে এখনই কেমন ছায়া-ছায়া।

শুঁড়িপথ দু-ভাগ হয়ে গেছে। আমরা বাঁ-দিক ধরলাম। ছুঁচলোমুখো

একটা জন্তু ঝোপের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখেই 'খ্যাচ' করে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

রতন বলল,—ব্যাটা শেয়াল। যেমন পাজি, তেমনি ভীতু।

আমরা দ্রুতপায়ে হাঁটছি। কোথাও জন-মানুষের চিহ্ন নেই। কয়েকটা কাঠবেরালি পাঁই-পাঁই করে গাছে উঠে গেল। পথে শুকনো পাতাপুতি স্তূপ হয়ে আছে। তার উপর আমাদের পা পড়ে একটানা শব্দ উঠছে—খচ্...মচ্...খচ্...মচ্...। একটু গা ছমছম করে উঠছে।

সামনে আবার পথ দু-ভাগ হয়ে গেছে। রতন বলল,—বাঁ-দিকে, তাই তো?

আমি উত্তর দেবার আগেই বাঁ-দিকের পথ থেকে হঠাৎ একজন মানুষ বেরিয়ে এল। লম্বা চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, লুঙির ওপর হাফ-হাতা জামা। দ্রুত পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। মুখ নীচু করে হাঁটছে, তাই মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রতন ফিসফিস করে বলল,—বাব্বা, বাঁচা গেল। এতক্ষণে একটা লোক পেলাম। ওকে জিগ্যেস করে নিই, কী বলিস?

—নিশ্চয়ই, আমাদের ভুল হতেই পারে।

—দাদা শুনছেন?

লোকটা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তুলে তাকাল। বয়েস বেশি নয়, চল্লিশের আশেপাশে হবে। চোয়াড়ে চেহারা, অল্প অল্প দাড়ি। চোখদুটো একেবারে কোটরে ঢুকে গেছে।

রতন বলল,—দাদা, আমরা গোরাবাজার যাব। এদিকের ঘাটে যেতে হলে বাঁ-দিক, না ডানদিক?

—তোমরা আসছ কোত্থেকে?

—আঁধারমানিক থেকে। ওখানে আমাদের জমিদারি আছে।

—তোমরা কি ইন্দুভূষণ রায়—

আমি হড়বড়িয়ে বলে উঠলাম,—আমাদের দাদু। আপনি চিনতেন?

লোকটা অকারণে হেসে উঠল,—চিনব না? বিলক্ষণ চিনি।

—তবে তো ভালোই হল। আপনি যদি—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমরা হলে গিয়ে আমাদের জমিদারবাবু

ইন্দুভূষণ রায়ের নাতি, তোমাদের এটুকু উপকার করব না? ডানদিকের পথ ধরো। ওই পথে যেতে যেতে প্রথম মোড় ছেড়ে দ্বিতীয় মোড়ে বাঁ-দিক ধরবে। ব্যস, তারপর একেবারে সোজা পথ। গঙ্গা। বৈতরণীর ঘাট।

বলতে-বলতে লোকটা হনহন করে হাঁটা দিয়েছে আমাদের পাশ কাটিয়ে। একটা হালকা হাসির শব্দ কি কানে এল? ব্যাপারটা কী?

কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়েছি। মুখ চাওয়াচায়ি করছি।

—অরুণ কী করবি? হিসেব গোলমাল হয়ে গেল রে।

—হুঁ। ঠিক বুঝছি না। তবে বাজে কথা বলবে কেন আমাদের?

—চল। তাহলে ডানদিকই ধরি।

আমরা ডানদিকের শুঁড়িপথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। এবার আরও জোরে। পথা ছায়াছন্ন। আলো মরে এসেছে।

প্রথম মোড় ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় মোড়, এবার বাঁ-দিকে।

সোজা হাঁটছি তো হাঁটছিই। কিন্তু জঙ্গল ফুরোচ্ছে না যে! কোথায় গঙ্গা? কোনও জলের শব্দ ভেসে আসছে না।

বরং, চারপাশ দেখে মনে হচ্ছে, বন আরও গভীর হচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিস্তব্ধ, নিথর। অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

শরীরে একটু কাঁপুনি দিচ্ছে। একা-একা ফিরতে চেয়ে এ কী ভুল করলাম! দুজনে হাঁটতে-হাঁটতেই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। সাহস দেওয়ার, সাহস পাওয়ার চেষ্টা করছি।

রতন বলেই ফেলল,—আমরা কি পথ হারালাম রে?

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম,—ফিরে যাবি?

—কোথায়?

—যে পথে এসেছি, সেই পথে। লোকটা আমাদের—

খচ্-মচ্-খচ্! দুজনে শিউরে উঠে দুজনের হাত শক্ত করে ধরেছি।

একপাল খরগোশ। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে। লাফাতে-লাফাতে বাঁ-দিকে ঢুকে গেল। সে দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল।

ছোট-ছোট সিমেন্টের ঢিবি। কবর! গোরস্থান।

এ আমরা কোন চুলোয় চলে এসেছি? দুজনে পিছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

ছুটছি তো ছুটছিই...দিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে...আবছা আলো...অন্ধকার ঘাড় হয়ে এসেছে...

আজ কি বাড়ি আর ফিরতে পারব না? হে ভগবান, হে আল্লা...

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনের মোড়ে ঝোপের পাশে আবার একজন মানুষ। মানুষ, মানুষ। মানুষ না, যেন সাক্ষাৎ দেবতা!

টাক মাথা, দু-চারগাছি পাকা চুল। গোলগোল চেহারা। ফতুয়া গায়ে। ঝোঁপড়া গোঁফ। বয়েস পঞ্চাশের উপরে।

মানুষটি নিজের থেকেই বলল,—তোমরা এদিকে কী করছ? খোশবাগ গেছিলে?

—খোশবাগ?

—হ্যাঁ, ওদিকে তো খোশবাগ। সিরাজউদ্দৌলার কবরস্থান। খুব জঙ্গল। চিতাবাঘ বেরোয়। ওখানে গেছিলে কী করতে? অন্ধকার নেমে এসেছে!

—না-না, আমরা...আমরা...

রুদ্ধশ্বাসে রতন সব বলে যায়। ওর কথা ভয়ে, ক্লান্তিতে আটকে-আটকে যাচ্ছে।

—সে কী! তোমরা কত্তাবাবুর নাতি? ওই লোকটাকে কীরকম দেখতে বলো তো?

আমি গড়গড় করে তার চেহারার বর্ণনা দিলাম। বুড়ো লোকটি একটু চুপ করে সব শুনল। তারপর নিজের মনেই বলল,—বুঝেছি। নির্ঘাত ইউনুস! ছিঃ ছিঃ, এতদিন হয়ে গেল, এখনও রাগ পুষে রেখেছে। বাবুর ওপর রাগ, তোমাদের ওপর ঝাড়ছে।...এসো, আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি এসো। শেষ খেয়া ছেড়ে দেবে যে।

বাপ্‌রে! কী জোরে হাঁটছে বুড়ো মানুষটা! মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়ছে। আমরা দুজন ছুটেও ওর নাগাল পাচ্ছি না।

জঙ্গল আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে আসছে। আলোও পাচ্ছি একটু-

একটু, এখনও শেষ গোধূলির সামান্য আলো লেগে আছে ঝোপেঝাড়ে, গাছের পাতায়। শেষে একটা মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে মানুষটি বলল,—এসে গেছি। যাও, সোজা চলে যাও।...সামনেই ঘাট।

বলেই সে আবার জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছিল। রতন পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল,—আপনি-আপনি আমাদের বাঁচালেন। আপনাকে কী বলে যে...

কিছু না, কিছু না।—লোকটির গলা ভেসে এল,—এ আমার কর্তব্য। সারাজীবন তোমাদের নুন খেয়েছি। বেইমানি করতে পারব না। কত্তামাকে আমার পেন্নাম দিও। বোলো, তারিণী নায়েবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বুড়োকে আর দেখা যাচ্ছিল না। আমাদেরও কথা বলার সময় ছিল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে যখন ঘাটে এসে পৌঁছলাম, তখন নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। মাঝি লগি ঠেলতে শুরু করেছে।

আমরা দুজনেই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম,—মাঝি, মাঝি। যাব! আমরা যাব!

নৌকো ফিরে এল। আমরা হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠে পড়লাম। জিব বেরিয়ে গেছে। সারা শরীর জবজব করছে ঘামে, অবশ হয়ে আসছে হাত-পা।

গোরাবাজার ঘাট থেকে আমাদের বাড়ি অল্প। একটুখানি। দূর থেকে দেখতে পেলাম, বারান্দায় সারি-সারি হ্যাজাক আর সারি-সারি মুখ। পুরোপুরি সন্ধে নেমে গেছে। শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে আশপাশ থেকে।

মা-কাকিমাকে পাশ কাটিয়ে দোতলায় ঠাকুমার ঘরে ঢুকতে তিনি দুজনকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

—কী হয়েছিল দাদুভাই? আমি তো চিন্তা করে-করে...

ঠাম্মা, আমরা জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।—তারপর রতন থেমে-থেমে সব বলে গেল। মা কাঁসার গেলাসে জল নিয়ে এসেছিলেন। ঢকঢক করে জল খেলাম দুজনে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

সব শুনে ঠাকুমা শুধু বললেন,—সেজ বউমা, শুনলে তো?

—আজ্ঞে মা!

—দুটোকে এখনই আগুন আর লোহা ছুঁইয়ে চান করিয়ে দাও। আমি

দুটো লোহার চাবি দিচ্ছি। লাল সুতো দিয়ে ওদের কোমরে পরিয়ে দাও। ঠাকুর, ঠাকুর! নারায়ণ, নারায়ণ!

সে রাতে আর কথা হয়নি। এমন ক্লান্ত ছিলাম, একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন সকালে জানলাম ঠাকুমার এতসব ক্রিয়াকর্মের কারণ।

ইউনুস ছিল দাদুর ঘোড়াদার। সে-ই ঘোড়ার দেখভাল করত। দাদু তাকে খুব ভালোও বাসতেন। কিন্তু সে পরেপরে এত মাথায় চড়ে বসেছিল, কাউকে মানত না। একবার জমিদারিতে এমন নোংরা কাজ করে, সবাই এসে দাদুকে নালিশ করে। দাদু তখন সকলের সামনে তাকে চাবুক দিয়ে বেধড়ক পেটান। সে দিন রাতে ইউনুস গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে। সে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা।

তারিণীচরণ ছিলেন জমিদারির বিশ্বস্ত নায়েব। প্রভুভক্ত ও সৎ। তিনিও মারা গেছেন বিশ বছর হল।

অরুণ রায়মুখার্জি একনিঃশ্বাসে বলে থামলেন। ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে পিন-পড়া-নৈঃশব্দ্য। অরুণবাবু সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে আছেন জানলা দিয়ে। বাইরে অন্ধকার।

একটু পরে বললেন, কী বলবে? গাঁজাখুরি ভূতের গল্প?

সম্পাদকের সমস্যা

পিক...পিক...পিক...

—হ্যালো।

—দাদা, নগেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস এসেছেন। বলছেন, আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

ঘড়ির দিকে চোখ গেল। ছ'টা বাজতে দশ। লোকটা পাঁচ মিনিট আগেই এসে গেছে। উফ্!

অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম, ঠিক পাঁচ মিনিট পরে কাউকে দিয়ে উপরে পাঠিয়ে দাও।

মাত্র তিনশো সেকেন্ড সময়। তার মধ্যে নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে। পরের তিনশো সেকেন্ড ধরে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

যন্ত্রণা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! গত দু-বছর ধরে লোকটা ফেভিকলের মতো আমার গায়ে সেঁটে আছে। নাছোড়বান্দা। কোত্থেকে আমার মোবাইল নাম্বার জোগাড় করেছে। প্রায় প্রতিদিনই ফোন। ওর নাম্বার চেনা হয়ে যেতে ফোন ধরা বন্ধ করলাম! তখন নানারকম নাম্বার থেকে করতে শুরু করল। অচেনা নাম্বার! না ধরে উপায় নেই।

ধরলেই একটা কথা, 'আপনি আমায় যেকোনও দিন যখন খুশি পাঁচটা মিনিট সময় দিন।'

এখানেই শেষ নয়। কোনও সভা-সমিতিতে দেখা হলেই হনহন করে এগিয়ে এসে নমস্কার, 'ভালো আছেন'?

হঠাৎ-হঠাৎ চিনতে পারি না। প্রত্যুত্তরে সৌজন্যবশত বলে ফেলেছি, 'হ্যাঁ। আপনি ভালো?'

ব্যস। অমনি একগাল হেঁসে, 'স্যার, পাঁচটা মিনিট সময় চাইছি।'

লোকটাকে দেখতেও ভারি অদ্ভুত। চকচকে টাকের চারিদিকে গুছিকয়েক তামাটে চুল। তামাটে গোঁফ। থুতনির কাছে কনফুসিয়াসের মতো দাড়ি। তার রংও তামাটে। চোখে একটা সোনালি ফ্রেমের গোল চশমা। কালো প্যান্ট, উপরে ছোপ-ছোপ কটকটে রঙের পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলা।

নগেন্দ্রনারায়ণের একটাই স্বপ্ন। কবি হবেন। এযাবৎকাল শয়ে-শয়ে ছড়া-কবিতা পাঠিয়েছেন আমাদের দপ্তরে। একটিও মনোনীত হয়নি। আরও সোজাসুজি বললে, সম্পাদকীয় দপ্তর মনোনীত করে উঠতে পারেননি।

ওর এই পাঁচমিনিটের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে শেষপর্যন্ত আমি দপ্তরকে অনুরোধ করেছিলাম, 'ভাই, তোমরা একটু কেটে-ছেঁটে ছেপে দাও।'

ওরা নগেন্দ্রনারায়ণের কবিতার তাবড়া এনে হাজির করেছে আমার টেবিলে!

'আপনিই বেছে দিন।'

নাঃ, আমিও পারিনি। সুতরাং এই যন্ত্রণা আমার প্রাপ্য।

কী বলবে নগেন্দ্রনারায়ণ? পদ্য ছাপার জন্যে হাতে-পায়ে ধরবে নাকি?

দরজায় টোকা পড়ল।

—আসুন।

—নমস্কার। নমস্কার।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন নগেন্দ্রনারায়ণ।

—বসুন।

—ভালো আছেন স্যার?

—চলে যাচ্ছে। বলুন।

—স্যার, আমার আগের লেখাগুলো নিয়ে কিছু বলব না স্যার। শুধু নতুন যে দুটো কবিতা লিখিচি, একটু শোনাব।

এই রে! এখন কবিতা শুনতে হবে?

—স্যার, পাঁচমিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে। ছোট কবিতা।

কিছু করার নেই। কানের ফুটোগুলো বন্ধ করারও কোনও উপায় জানা নেই।

—স্যার, অত খারাপ লাগবে না স্যার। অনেক যত্ন করে লিখিচি।

আবার একগাল হাসলেন নগেন্দ্রনারায়ণ। কবিতা দুষ্পাচ্য লিখলেও লোকটা ভালো পারফিউম ব্যবহার করে। সুন্দর মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে এয়ারকন্ডিশন্‌ড চেম্বারে।

—পড়ুন।

নগেন্দ্রনারায়ণ ফাইল খুলে পড়তে শুরু করলেন :

যুঁই ফুল ফুটিল,
সন্ধ্যাগগনে চাঁদ ওই উঠিল।
মেঘ কেটে গোল চাঁদ
জ্যোৎস্নার সে কী ফাঁদ
সেই ফাঁদে পড়িয়া
মন নেচে উঠিল।
মন নাচে বাঁশি বাজে
সে কী মধুর সুর
সুর ভেসে চলে দূর-বহুদূর।...

নগেন্দ্রনারায়ণ থামলেন। জিজ্ঞাসুচোখে তাকালেন। এসির ঠান্ডা ঘরে আমি পাথরের মূর্তির মতো চোখ বুজে। আলতো করে দুদিকে মাথা নাড়তে হল। এ কবিতা ছাপলে পত্রিকার বারোটা বাজবে।

—হয়নি তো স্যার? বেশ। এবার এটা শুনুন।

আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, এখনও দু-মিনিট বাকি।

দ্বিতীয় কবিতা শুরু হয়ে গেল!

আমি চাই বহুদূর যেতে
পাহাড় নদী নীল ধানখেতে
সমুদ্র ডাকে, আয় আয়
পথ আমার ডাইনে বায়
যাব কোথায় জানি না
নিষেধবিধি মানি না
তবু চাই বহুদূর যেতে
যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে
প্রকৃতি হাত পেতে...

নগেন্দ্রনারায়ণ ফাইল বন্ধ করলেন। আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, এটাও হয়নি, না স্যার? আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পেরিচি।

না মানে,—আমি দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললাম, এই কবিতাটাতে তবু একটা ভাব রয়েছে। খানিকটা ঘষামাজা করলে—

—আপনি করে দেবেন স্যার?

—না-না। আমি করব কেন? বুঝলেন, আমি কবিতা ঠিক বুঝি না। আপনি বাড়িতে নিয়ে যান। নিজে বারবার পড়ুন। কোথায়-কোথায় দুর্বলতা, ঠিক বুঝতে পারবেন।

—না! পারব না! যা করার আপনাকেই করতে হবে।

—মানে?

—মানে খুব পরিষ্কার। দু-বছর আপনার পিছনে লেগে থেকে পাঁচ

মিনিট সময় পেয়েচি। ছ-আট লাইনের কবিতা ছাপার জন্যে। আমি বেরিয়ে গেলে আর আপনার নাগাল পাব না। সুতরাং যা করার আপনাকেই করতে হবে। আপনাকে কথা দিতে হবে, আপনার পত্রিকায় আমার নামে একটা কবিতা ছাপা হবে।

আমি স্তম্ভিত! এসির মধ্যেও কপালে ঘাম ফুটছে। লোকটা বলে কী! আমার চেম্বারে বসে আমায় অর্ডার করছে। নাঃ! আর রাগ চেপে রাখা যাচ্ছে না।

- -যদি না করি? যদি না ছাপি, কী করবেন? কী করবেন আপনি?

—সুইস্-সাইড! সুইসাইড করব। বুঝলেন! ট্রেনে গলা দেব। কিংবা সিলিং-এর দড়িতে ঝুলে পড়ব। লিখে যাব, দিনের পর দিন কীভাবে আপনি আমায় মেন্টাল টরচার করেচেন। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েচেন।

—বাঃ! চ-মৎকার! আপনি তো মশাই বদ্ধ উন্মাদ। একলাইন লিখতে পারেন না। যা ছাইপাশ লেখেন, তা ছাপতে হবে? না ছাপলে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হল?

—হ্যাঁ, হল। একশোবার হল। সম্পাদকের কাজ চারটে তৈরি লেখা জড়ো করে ছেপে দেওয়া নয়। সম্পাদকরা লেখক তৈরি করেন। আপনি সেটা করেচেন কোনওদিন? এই যে আমি অ্যাদ্দিন আপনার পেছনে পড়ে আছি, তার কোনও দাম নেই?

—না নেই। সবার সব কিছু হয় না। আমি প্লেন চালাতে পারি না। আপনি কবিতা লিখতে পারেন না।

—পারি না? বেশ। তাহলে আমি সুইসাইডই করব। এসপার, নয় ওসপার। তখন দোষ দেবেন না।

—না, দেব না। এখন যান। যা পারেন করুন গে যান। নইলে আমাকেই সুইসাইড করতে হবে। উফ্! বদ্ধ পাগল!

নগেন্দ্রনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। মুখে লেপটে আছে দুর্বোধ্য একটা হাসি। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। রাগে, না দুঃখে?

ঘড়িতে দেখলাম, ছ'টা বাজতে পনেরো সেকেন্ড বাকি।

—করব? সুইসাইড করব? আপনি বলছেন?

—হ্যাঁ বলছি।

—যদি বলি, সুইসাইড করেই আপনার কাছে এসেছি? এতদিনের বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে? আমি জানতাম, যতই ভালো লিখি, আপনি কিছুতেই ছাপবেন না।

কী বলছে লোকটা?

হঠাৎ দেখলাম, আমার টেবিলের সামনের চেয়ার ফাঁকা! ঘরে কেউ নেই।

সর্বাঙ্গ দিয়ে বরফস্রোত নেমে গেল। এইমাত্র লোকটা জলজ্যান্ত বসে ছিল! আমি, আমি ঠিক দেখছি? মগজ-হাত-পা অবশ। টেবিলের পাশের বেলটা দেখতে পাচ্ছি, টিপতে পারছি না।

শোঁশোঁ করে এসি আর ফ্যানের শব্দ। ঘরের আলোগুলো প্যাট-প্যাট করে জ্বলছে। আমি পুরো জড়ভরত, একতাল মাটি। চোখ বুজে এল। আমি বোধহয় জ্ঞান হারাচ্ছি।

পরক্ষণে 'হাঃ-হাঃ-হাঃ'!

প্রবল হাসির শব্দে চোখ খুলে গেল। কোথায় ভ্যানিস? নগেন্দ্রনারায়ণ দিব্যি বসে আছেন সামনের চেয়ারে। শয়তানের মতো দুলে-দুলে হাসছেন!

—কী সম্পাদকমশাই? এটুকুতেই কেলিয়ে পড়লেন। কিছু বলুন?

কী বলব? প্রাণপণে বলার চেষ্টা করছি, ছাপব, ছাপব। যা ছাইপাশ লেখো, একশোবার ছাপব। ছাপতেই হবে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। জলের মতো ঘাম বইছে শরীর দিয়ে।

খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে-হাসতে নগেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—এই যে ধরুন স্যার, আপনি এখন একেবারে একা। অসহায়। এখন যদি আপনার গলাটা খপ্ করে টিপে ধরি, একটুও আওয়াজ বেরুবে? কেউ জানতে পারবে?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি।

—না, না, আমায় উঠতেও হবে না। এখানে বসে-বসেই—

স্পষ্ট দেখলাম, বিরাট টেবিলের ওপ্রান্ত থেকে নগেন্দ্রর হাতটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই গতখালির ভূত-বউয়ের মতো, ঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সে গাছ থেকে লেবু পাড়ছিল।

হাতের পাঁচটা আঙুল সাঁড়াশির মতো এগিয়ে আসছে আমার গলার দিকে!

আতঙ্কে চোখ বুজে আসছে...আর কয়েক মুহূর্ত...গলায় আঙুলের কনকনে স্পর্শ পাচ্ছি...

—চোখ খুলুন! ও সম্পাদকমশাই! চোখ খুলুন!

কেউ ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিচ্ছে। চেতনার শেষপ্রান্ত থেকে ফিরে আসছি।

তাকিয়ে দেখলাম। রিভলবিং চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছি। আমার জলের গেলাস থেকে মুঠো করে জল ছেটাচ্ছেন, আর কেউ নয়, নগেন্দ্রনারায়ণ। আমার জামাটামা ভিজে চুপচুপে।

—সরি! আমায় ক্ষমা করবেন। অতিরিক্ত রাগে, ডোজটা একটু বেশি হয়ে গেছে।

এখনও আমার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে আসেনি।

—কবিতা লেখা আমার নেশা। পেশা যেটা, তার গেস্ট কার্ড রেখে গেলাম। মহাজাতি সদনে প্রিমিয়ার শো। যাবেন প্লিজ। আর পারলে একটা কবিতা ছেপে দেবেন কাটাছেঁড়া করে।

নগেন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিনিটখানেক ওই অবস্থায় পড়ে রইলাম। ধীরে-ধীরে সোজা হওয়ার ক্ষমতা ফিরে এল।

টেবিলের ওপরে দু-খানা গেস্ট কার্ড। মহাজাতি সদনে জাদুকর বি. এন. নারায়ণের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী। সামনের শনিবার।

বিশ্বাস নগেন্দ্র নারায়ণ!

অবশেষে অবুদা এলেন

খুব চিন্তা হচ্ছিল। কেতকী মেয়েকে নিয়ে বেহালা গেছে। বিকেল থেকে শুরু হয়েছে একটানা বৃষ্টি। চারিদিক জলে ভাসছে। আমাদের গলি একটু উঁচু। সেখানেও গোড়ালি ছাপিয়ে জল।

বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষ্মণ দেখছি না। ওরা ফিরবে কী করে, কে জানে! বাড়িতে আমি একা।

এইসময় দপ্ করে লাইট চলে গেল। নির্ঘাৎ সি.ই.এস.সি. থেকে সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। একেবারে সোনায় সোহাগা।

ঠক্-ঠক্-ঠক্...! সদর দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। কে এল এই অসময়ে?

—কে?

—আমি। দরজা খুলে দ্যাখ্।

গলাটা খুব চেনা-চেনা ঠেকছে। দরজা খুলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

অবুদা! অবিনাশ ঘোষ!

—কীরে, হাঁ করে দেখছিস কি? চিনতে পেরেছিস?

—বলো কী? তোমায় চিনব না? তুমি তো বিশেষ বদলাওনি। চুলগুলো শুধু সাদা।...এসো, ভিতরে এসো।

অবুদার সর্বাঙ্গ ভিজে চুপচুপে। টপটপ করে জল পড়ছে মেঝেয়। একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—আমার যা অবস্থা, ভিতরে ঢুকলে সব ভিজে যাবে। বাথরুমে তোয়ালে আছে? একটু মুছে নিতুম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এসো এদিকে।

অবুদা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। এতকাল পরে, এত যুগ নিরুদ্দেশ থাকার পর হঠাৎ আমার বাড়িতে! এই জলঝড়ের সন্ধ্যায়। কী এমন ঘটল?

আমার তো অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে...সেই যুবক বয়েস, রকের আড্ডা, দলবেধে পিকনিক, সিনেমা...।

অবুদা তোয়ালেতে মাথা-গা-হাত মুছে বেরিয়ে এসেছেন বাথরুম থেকে। ভিজে প্যান্টসার্টটাই নিংড়ে পরেছেন ফের। কোণের কাঠের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন।

—এ কী অবুদা! তুমি ভিজে প্যান্টসার্ট পরলে কেন? ছেড়ে ফ্যালো। ঠান্ডা লেগে যাবে। আমি তোমায় শুকনো লুঙি-জামা দিচ্ছি।

—নারে বাবুন! কিচ্ছু হবে না। আমার সব সয়ে গেছে।

একটু থেমে বললেন,—আসলে কি জানিস, ছুটি পাচ্ছিলুম না। তা ছুটি যখন হঠাৎ করে পেয়ে গেলুম, তখন আর দেরি কেন! সোজা চলে এলুম মায়ের কোলে। নিজের দেশে।

—কবে এসেছ?

—কবে কী রে? আজকেই। অনেক কাজ। পরপর সবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—আজকের দিনটা একটু জিরিয়ে নিতে পারতে। এত বৃষ্টি!

—দূর! আমার এখন পুরোটাই ছুটি। জিরোনোর অঢেল সময়।

—তুমি এখন আছ কোথায়? হপ্তাখানেক আগে অখিলের সঙ্গে দেখা হল। ও বলল, প্রায় বছরখানেক দাদার কোনও খবর নেই। তোমার লাস্ট চিঠি এসেছিল বেলগ্রেড থেকে। তার উত্তরে ও চিঠি পাঠিয়েছিল। কোনও জবাব আসেনি।

ঠিকই বলেছে ভাই।—অবুদা ম্লান হেসে বললেন,—ভেবেছিলুম, হঠাৎ করে দেশে ফিরে সবাইকে সারপ্রাইজ দেব। বেলগ্রেড থেকে মাসদশেক আগে আমি চলে এসেছিলুম লন্ডনে। অনেক বেটার অফার ছিল।

—বড় চাকরি?

—নারে। আগে চাকরি করতুম। বছর পাঁচেক হল, ছেড়েছুড়ে দিয়ে কনসালটেন্সির কাজে নেমে পড়লুম। বাংলায় যাকে বলে শিল্প-উপদেষ্টা। মিত্তালদের এক রিলেটিভদের ইন্ডাস্ট্রি আমায় ডেকে নিল। ভালোই মালকড়ি দিচ্ছিল। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগসুবিধে।

—বিয়ে-থা করেছ? অখিল কিছু জানে না।

—সময় পেলুম কই রে! ছোটার নেশায় ধরল। ছুটতে-ছুটতে সময় ফুরিয়ে গেল।...যাক্‌গে, তোর কথা বল্‌। আর সবাই কোথায়?

—আর সবাই বলতে এখন শুধু বউ আর মেয়ে। বাপের বাড়ি গেছে। সরকারি দপ্তরে চাকরি করছি। চলে যাচ্ছে।

—গুড। চলে গেলেই হল। চাকা বন্ধ হলে বিপদ। এই যেমন আমার, চলতে-চলতে ছুটি। ব্যস!

—অন্য একটা কাজ জুটিয়ে নাও। এখানেই পেয়ে যাবে।

—আর কাজ করব না। এখন আমার একটাই কাজ বাকি। যেখানে যা-যা দেনা আছে, সব মেটানো। সেজন্যেই তো এলুম রে।

দেনা! কথাটা খচ্‌ করে বিঁধল। অবুদা কি পঁচিশ বছর আগের কথা বলতে চাইছে?

সে বড় কষ্টের জায়গা! কতদিন আমায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। ভুলতে চেয়েছি, ভুলতে পারিনি।...তারপর একসময় ধীরে-ধীরে সব সয়ে এল। ভুলেই গেছি।

অবুদা তখন আমাদের দশ-বারোজন যুবকের দলের নেতা। আইডল।

পাস-টাস করে সবাই তখন চাকরির চেষ্টা করছে। আমি আর অবুদা বাদে। আমি বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে ঢুকে পড়েছি বাবার বইয়ের ব্যবসায়। আর অবুদা ঠিক করেছে, কারও চাকরি করবে না। চেষ্টা করছে স্বাধীন ব্যবসা করার। কতরকম আইডিয়া ঘুরছে তার মাথায়। কিন্তু সবকিছুই আটকে যাচ্ছে একজায়গায় এসে। ব্যবসা করতে মূলধন চাই। কোথায় পাবে ক্যাপিটাল? কে দেবে?

যতদিন যাচ্ছে, একটু-একটু করে পরিস্থিতি পালটাচ্ছে। এক-একেকজন কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। কলকাতা ছেড়ে কেউ-কেউ মফঃস্বল বা অন্য শহরেও চলে যাচ্ছে চাকরির সূত্রে। সন্ধেবেলা ঝামাপুকুর পার্কে আমাদের জমায়েত ক্রমেই পাতলা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ একদিন বিকেলে আমাদের কলেজ স্ট্রিটের দোকানে অবুদা এসে হাজির। দোকানে তখন ব্যাপক ভিড়। পাঠ্যবইয়ের মরসুম। আমি ক্যাশ নিচ্ছি। অবুদার দিকে অবাকচোখে তাকালাম। কী ব্যাপার? এর আগে অবুদা কোনওদিন এখানে আসেনি।

ভিড় একটু কমলে ক্যাশের দায়িত্ব অন্য একজনকে দিয়ে অবুদাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

—কী গো? হঠাৎ?

—হ্যাঁরে বাবুন। খুব বিপদে পড়ে গেছি। উপকার করতে পারবি?

—বিপদ! কী বিপদ হল?

—শোন, আমার সব ফাইন্যাল হয়ে গেছে। কাল থেকে মুরগির পোলট্রি শুরু করছি আমাদের জনাইয়ের বাড়িতে। বড় স্কেলে। সব রেডি। শুধু পাঁচ হাজার টাকা কম পড়ে গেছে। পুরো টাকাটা বিভিন্ন সোর্স থেকে লোন করেছি। এই টাকাটা যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পাওয়ার কথা, তিনি আর্জেন্ট কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। পরশু ফিরবেন। এদিকে কাল সকালে পেমেন্ট করতেই হবে। তুই যদি আমায়, জাস্ট দুদিনের জন্যে ধার দিস, আমি বেঁচে যাই। ব্যাবসা স্টার্ট করতে পারি। দিবি ভাই?

—আমি...মানে আমি...কোত্থেকে এত টাকা—

—কেন তোদের দোকানের সেল থেকে। এতবড় দোকান। এখন বইয়ের সিজন।

—কিন্তু বিক্রির টাকা সবটাই যায় বাবার কাছে। আমি রাতে সেল মিলিয়ে বাবাকে দেখিয়ে লকারে রেখে দিই।

—ব্যস, তাহলে আর অসুবিধে কী? আজকের সেল থেকে শুধু পাঁচ হাজার বের করে নিবি। উনি তো আর গুনতে যাচ্ছেন না।

—প্রত্যেক শনিবার সমস্ত টাকা মেমোর সঙ্গে মিলিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে!

—হোক না! আজ সবে মঙ্গলবার। বেস্পতিবারের মধ্যে তুই টাকা ফেরত পেয়ে যাচ্ছিস।

—আমি...মানে...

—প্লিজ বাবুন! আমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে দে। আমি কথা দিচ্ছি, তোর কোনও অসুবিধে হবে না।

অবুদা আমার দুটো হাত ধরে কাকুতিমিনতি করছিল। আমি ওকে ফেরাতে পারিনি।

বুধবার থেকে অবুদাকে আর পাড়ায় দেখা গেল না। প্রথম দুটো দিন ভেবেছি, নিজের নতুন ব্যবসা নিয়ে জনাইতে পড়ে আছে। কিন্তু যখন শুক্রবার গোটা দিন পেরিয়ে গেল, সন্ধেবেলায় ছুটলাম ওদের বাড়ি।

একতলা ভাড়া বাড়ি। নিঃশব্দ, নিঝুম। ডাকাডাকি করতে অখিল থমথমে মুখে বেরিয়ে এল। সে যা বলল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল।

অবিনাশ ঘোষ নিরুদ্দেশ। মঙ্গলবার রাত থেকে। ব্যবসা-ট্যাবসা সব বানানো। যাওয়ার আগে বাবা-মাকে একটা চিঠি লিখে গেছে।

'আমি বেরিয়ে পড়ছি। ভাগ্যান্বেষণে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। অনেক চেষ্টা করে বুঝলাম, এখানে কিছুই হবে না। বরং, জীবনটাকে বাজি রেখে একবার দেখি।

তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো। খোঁজ কোরো না। চিন্তা কোরো না।...আমি ভালো থাকব।...'

এরপরে আমার অবস্থা কী হয়েছিল, সহজেই অনুমেয়। কেউ বিশ্বাস করেনি আমায়। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছ থেকে সহ্য করেছি ধিক্কার। দিনের-পর-দিন।...

বাবা ব্যবসা থেকে আমায় সরিয়ে দিলেন। চাকরি খুঁজেছি পাগলের

মতো। শেষপর্যন্ত সরকারি দপ্তরে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি। আমাদের অত চালু ব্যাবসা বাবার অবর্তমানে শেষপর্যন্ত উঠে গেল। এই লোকটা, সামনের এই লোকটা সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী!

—কী রে বাবুন, গালে হাত দিয়ে কী ভাবছিস? সেইসব দিনের কথা মনে পড়ছে? আমি সরি বাবুন। প্লিজ এক্সকিউজ মি।

চট করে ঘোর কেটে গেল। ফিরে এসেছি অতীত থেকে বর্তমানে।

ঘর পুরো অন্ধকার। অবুদাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ঝুপসি আঁধারে কালো অবয়ব হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে।

—দাঁড়াও! একটা মোমবাতি জ্বেলে দিই। অনেকক্ষণ ভূতের মতো বসে আছি।

মোমবাতি খুঁজতে উঠতে যাচ্ছি, অবিনাশদা আমায় নিরস্ত করলেন।

—কোনও দরকার নেই। আমি এখন উঠব রে। তোর মতো আর যাদেরকে ঠকিয়েছি, সবার কাছেই যেতে হবে।

একটু থেমে ভারী গলায় বললেন,—সেসময় অনেকের কাছ থেকেই মিছে কথা বলে ধার নিয়েছিলুম।

—আজকেই সবার কাছে যাবে?

—হ্যাঁ রে। এরপর আর সময় পাব না।

—তোমার কথা যে কিছুই শোনা হল না! এতবছর ইওরোপের দেশে-দেশে কাটালে!

—পরে শুনিস। আসব আবার। এখন আমার অঢেল অবসর।

বলতে-বলতে অবুদা উঠে দাঁড়ালেন। হাতে মুখবন্ধ মোটা বড়সড় খাম। এগিয়ে দিয়ে বললেন,—এটা রাখ।

—কী এটা?

—দ্যাখ বাবুন, তোর ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না। তবু যতটুকু...এতে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার দেওয়া আছে। তোর ব্যাঙ্কের নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার শুধু বসিয়ে নিস।

পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে ভেজানো দরজা খুলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছু বলার সুযোগ পেলাম না।

আমি খামটা হাতে ধরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি।....

মিনিটখানেক হয়নি, ঘর ঝলমল করে উঠল আলোয়। ওঃ, বাঁচা গেল।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, জল প্রায় নেমে গেছে। আকাশে দু-একটা তারা ফুটেছে।

ঘরে ফিরে টিভি চালিয়ে দিয়েছি। একটু বাদেই খবর হবে।

বাইরে ট্যাক্সির শব্দ। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ের তর্জন,—পা-পা! দরজা খোলো!

—খোলা আছে। চলে আয়।

বুক থেকে আশঙ্কার পাথর নেমে গেল। সত্যি, নানা চিন্তায় বিকেলে যেমন দমবন্ধ হয়ে আসছিল, এখন সব কেটে যাচ্ছে ম্যাজিকের মতো। কেতকী-মামন ঠিকঠাক ফিরে এসেছে। শান্তি, বড় শান্তি।

কেতকী-মেয়ে ঘরে ঢুকে এসেছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—জান, জান, আজ আমাদের সেই নিরুদ্দেশ অবুদা, মানে অবিনাশ ঘোষ এসেছিল। এই পাঁচ মিনিট হল। একটু আগে হলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত!

কেতকী অবুদার ব্যাপারটা জানে। আমার কাছেই শুনেছে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝংকার দিয়ে উঠল,—এসছিল? দেখা হয়নি, ভালো হয়েছে। আমি দু-চারটে বাজে কথা শুনিয়ে দিতাম। জোচ্চোর একটা। চিটার!

—আহা, ওরকম বোলো না! তখন নিরুপায় হয়ে...এই দ্যাখো। ফেরত দিয়ে গেছে।

—কী এটা?

—টাকা। এর মধ্যে। ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করেছে?

খামটা হাতে নিয়ে খুলতে গিয়ে আমি একটু চমকে গেলাম। এটা কী হল? খামের ওপরে আন্তর্জাতিক ক্যুরিয়ারের সিল। কিন্তু অবিনাশদা যে এইমাত্র নিজের হাতে দিয়ে গেলেন।

কেতকীর এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যঙ্গের সুরে বলে যাচ্ছে,—ওহ্! ভারি তো পাঁচ হাজার টাকা। পঁচিশ বছর আগে পাঁচ হাজারের দাম আর আজকের? কতগুণ হয়ে গেছে! আজ ও ক'টা টাকার কোনও মূল্য আছে?

আমি ততক্ষণে প্যাকেট খুলে ফেলেছি।

তাজ্জব! টাকা নয়। অ্যামাউন্টের জায়গায় ছাপা আছে, পাঁচ

হাজার পাউন্ড! পাউন্ড?...দ্রুত মনে-মনে হিসেব করে ফেলেছি, চার লক্ষ টাকা।

কেতকীর এদিকে খেয়াল নেই। তার চোখ টিভির পরদায়। সে চেঁচিয়ে উঠেছে,—দেখেছো? দেখেছ? এবার লন্ডনে! লাদেন সারা পৃথিবীকে শেষ করে দেবে।

টিভিতে ভাষ্যকার বলছেন, 'আজ ব্রিটিশ টাইম সকাল সাড়ে আটটায় লন্ডনের তিনটি মেট্রো স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে জনবহুল কিংসক্রস স্টেশনে।...প্রায় পঞ্চাশজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজন ভারতীয়, দুজন বাংলাদেশি, দুজন পাকিস্তানি।...'

এবারে নাম দেখাচ্ছে নিহত ভারতীয়দের। 'সুমন সিংহ, প্রভুদয়াল আগরওয়াল এবং...এবং...

অবিনাশ ঘোষ!'

আমার হাত থেকে খাম-কাগজ পড়ে গেল! কেতকী ভয়ার্ত চোখে তাকাল আমার দিকে।

মামাবাড়ি তাদের বাসা...

বড়মামার অনুরোধ রাখতে গিয়ে যে এমন বিপদে পড়ে যাব, ভাবতেই পারিনি।

কয়েকদিন আগেই বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম, এবারের পুজোয় বাঁকুড়া যাচ্ছি না। এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাইন্যাল ইয়ার। আমরা দুই বন্ধু মিলে হস্টেলে পড়াশুনো করব।

মহালয়ার আগের দিন বড়মামার ফোন।

—ডবলু, বড়মামা বলছি। তুই কোথায়?

—হস্টেলে বড়মামা।

—হ্যাঁ। দুলালী ফোন করেছিল। বলল, তুই পুজোর ছুটিতে কলকাতায় থাকছিস। পড়াশুনো করবি। ভালো, খুব ভালো করেছিস।

—হ্যাঁ বড়মামা।

—শোন, এক কাজ কর, বইখাতা নিয়ে আমাদের এখানে চলে আয়।

—হবে না বড়মামা। প্লিজ, কিছু মনে কোরো না। আমরা একটু নিরিবিলিতে প্রিপ্যারেশন—

—আরে বাবা, সেটাই তো বলছি। এবাড়িতে কেউ থাকছে না। পুরো ফাঁকা। নিজের মতো থাকবি। চুটিয়ে লেখাপড়া করবি।

—ফাঁকা মানে? তোমরা থাকছ না? বড়দা—ওরা আসছে না পুজোয়?

—নারে। পিকলু ফোন করেছিল। ও তো এখন কাঁথির এসডিও। পুজোর সময় মুখ্যমন্ত্রী শঙ্করপুর যাবেন। ওকে থাকতে হবে। তোর মাইমা নাছোড়বান্দা। ছেলের সঙ্গে দেখা করবেই। এখন সমস্যা হচ্ছে, এত বড় বাড়ি কার ভরসায় ফেলে যাই! দুলালীর কাছে তোর খবরটা পেয়ে সঙ্গে -সঙ্গে ভাবলাম, সমস্যাটা মিটে গেল। বাবা, না করিস না। মোটে চারদিনের জন্যে যাচ্ছি। এখানে উপেন থাকছে, বাসন্তীর মা থাকছে, ছবিলাল, বিন্দেশ্বর থাকছে। তোর কোনও অসুবিধে হবে না বাবা।

—আমার সঙ্গে বাবলু থাকবে যে।

—বাবলু? তোর বন্ধু? থাকুক না! আমরা তো চিনি ওকে। আরও ভালো হল। দুই বন্ধুতে মিলে থাকবি।

এরপর আর কথা চলে না। অতএব ষষ্ঠীর দিন সকালে ব্যাগ-বোঁচকা নিয়ে দুজনে হাজির হলাম মামার বাড়ি।

বাড়ি না বলে পেল্লায় একখানা জাহাজ বলাই ভালো। উত্তর কলকাতার পার্শিবাগান লেনে প্রায় দশ কাঠার ওপর পাঁচতলা প্রাচীন বাড়ি। অসংখ্য ঘর। এদিকে সিঁড়ি, ওদিকে সিঁড়ি। গোলোকধাঁধা। একতলায় বড়মামার অফিস, কারখানা। দোতলার অধিকাংশ ঘর তালাবন্ধ। তিনতলা-চারতলা জুড়ে মামা-মামি থাকেন ঠাকুর-কাজের লোক নিয়ে।

দোতলায় সিঁড়ির মুখে বেশ বড়সড় একখানা ঘর। চেয়ার-টেবিল, খাট-বিছানা পাতা। সামনে বাথরুম। বাইরের লোকজনের গেস্টরুম। ওটাই বেছে নিলাম। বাড়ি পাহারাও হবে, নিজেদের মতো থাকাও যাবে। উপেনঠাকুর টাইম-টু-টাইম টিফিন-লাঞ্চ দিয়ে যাবে।

মামি একটু 'কিন্তু-কিন্তু' করছিলেন। ঘরের ছেলে, বাইরের গেস্টরুমে কেন থাকবে! মামা আমাদের ইচ্ছেটা বুঝলেন।

কর্তা-গিন্নি গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন। বাবলু সটান খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল।

—যাই বলিস ডবলু, ব্যাপারটা জমে গেছে। দুজনের কব্জায় এতবড় একখানা ফার্নিশড ঘর। কোথায় লাগে হস্টেলের ছ্যাৎলাধরা ঘর!

—শুয়ে পড়লি কেন? উঠে বোস। শুরু করি।

—আঃ, একটু এনজয় করতে দে! উপেনকে চা করতে বল।

সারাদিনটা ভালোমন্দ খেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়েই কেটে গেল। বাবলুটা মহা ফাঁকিবাজ। সন্ধেবেলা ঘণ্টাদুয়েক পড়াশুনো হল। তারপরে পুজো প্যান্ডেলে। ফিরলাম দশটায়। রাতের খাওয়া শেষ করেই দেখি, বাবলু ফের বিছানায়।

—কী রে! রাতে পড়বি না?

—আজকে ছাড়। কাল ভোর থেকে সংগ্রাম শুরু করব। অতটা হেঁটেছি, তারপর এত খাওয়া—শরীর ছেড়ে দিয়েছে মাইরি।

কী আর করা! আমি একা-একাই চেষ্টা করলাম। হয়? পাশে একজন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমারও চোখ টেনে এল।...

অ্যাই। অ্যাই ডবলু, অ্যাই!—বাবলু ঠেলছে আর ফিসফিস করছে। ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ক্-কী? কী হল?

—ও-ওই যে! শোন্। শুনতে পাচ্ছিস?

ঘুমের চটকা ভাঙতে যেটুকু সময় লেগেছে।

বাইরের করিডোরে কারা 'খস্-খস্'। হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে। আর 'খট্-খট্'! দরজার কড়া নাড়ছে। চারিদিক নিঝুম। কোনও শব্দ নেই।

সর্বাঙ্গ দিয়ে বরফ-জল নেমে গেল। চোরডাকাত? খবর পেয়ে চলে এসেছে? বাইরের গেট তো বন্ধ। নীচে থেকে দরোয়ানদের সাড়া পাচ্ছি না।

মাথার বালিশের পাশে মোবাইল ফোন। বোতাম টিপে দেখলাম, রাত তিনটে।

—বাবলু, কী করব?

—এখন কিছুই করার নেই। যদি চোরগুণ্ডা হয়, তবে আমরা এ ঘরে আছি জানলে খুন করে রেখে যাবে। দুজনে কী করব?

—একবার উঠে দেখব না?

—নাঃ! খবর্দার!

বাইরে হাঁটা-চলার শব্দ আরও বেড়েছে। কেউ সমানে কড়া নেড়ে যাচ্ছে প্রবল জোরে।

বাবলু আমায় টপকে খাট থেকে নামল। পা টিপে-টিপে। জানলার কাছে গেল। পরক্ষণেই প্রায় ছুটে চলে এসে শুয়ে পড়ল।

—আশ্চর্য!

—কী?

—মেন গেট বন্ধ। তারপরের কোলাপসিব্‌ল গেটটাও তালা দেওয়া।

—অ্যাঁ! তাহলে ঢুকল কী করে?

—সেটাই তো ভাবছি। ছাদ দিয়েও নামতে পারে।

—দু-র! তিনতলা-চারতলায় দু-দুখানা কোলাপসিব্‌ল। ভাঙার একটা শব্দ পাব না? তুই ওঠ্‌। আলো জ্বেলে দেখি।

উঠে পটাপট আলো জ্বেলে দিলাম। ভেজানো দরজা খুলে কারিডরে বেরিয়ে এসেছি। এবং সুইচ টিপে দিয়েছি।

যা-বাব্বা! কেউ কোথাও নেই। কোনও আওয়াজও নেই। মুহূর্তে কোন মন্ত্রবলে সব থেমে গেছে। একতলা থেকে ভেসে আসছে দুই বিহারি দরোয়ানের নাকডাকার গর্জন।

দুই বন্ধু স্তম্ভিত। দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। প্রায় চারটে বাজে। অদ্ভুত ব্যাপার। স্পষ্ট শুনলাম এতক্ষণ। এখন কেউ নেই।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মাথা গরম হয়ে উঠেছে। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।...

বিন্দেশ্বর আর ছবিলাল খানা পাকাচ্ছিল। দুজনেরই বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলায়। তাগড়া চেহারা, ইয়া গোঁফ। বড়মামার বহুকালের বিশ্বস্ত অনুচর।

কিন্তু কাল রাতের ঘটনা শুনে দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেল।

ছবিলাল খইনি ঝেড়ে একটিপ এগিয়ে দিল বিন্দের দিকে। বলল,—বিন্দেভাই, ডাবলুবাবুকে কুছু বোলিব? ইস্ বেপারে?

খুন্তি নাড়তে-নাড়তে বিন্দে বলল,—বোলো না! সাচ বাত বোলনাই ঠিক হ্যায়।

ছবিলাল বলল,—ডাবলুবাবু, আমরা জানি। আছে! বহোতদিনসে আছে।

—আছে? ক্-কী আছে?

—তারা। কুনো ক্ষতি করে না। উনারা ওদের মতো থাকেন। আমরা আমাদের মতো থাকি। রাত হলে উনরা ঘুমে-ফিরে বেড়ায়, সোকালে থাকে না। উদের পুরানা জাগা তো! মায়া কাটাতে পারে না।

বাবলু আমার হাত খিমচে ধরেছে।

—ক্-কাদের কথা বলছ তোমরা?

—রামরাম! ইখনও বুঝেননি? উনরা হোলেন গিয়ে অপদেওতা।...

—অপদেবতা! মানে ভ্-ভূত। এখানে কেন?

—আসবে কেন? আছে তো। আজ পঁচাশ-ষাট সালো সে আছে। হামার বাবা তো বড়াবাবুর বাবার আমলে ছিলেন। উনার কাছে শুনেছি, এহি মোকান যোখোন তৈয়ার হয়, ইখানে কবরস্থান ছিল। ওনেক হাড়গোড় বেরাইছিল ভিত করার টেইমে। পূজা-উজা ভি হইয়েছিল। লেকিন যায়নি। তোবে হাঁ, উনরা কোই নুকসান কোরে না।

পাশ থেকে বাবলু ফিসফিস করে বলল,—চল্, আজই পালিয়ে চল্।

চুপ কর্।—ওকে চাপা ধমক দিয়ে ছবিকে বললাম, বড়মামা জানেন?

ছবিলাল হাসল। বলল,—জানেন তো লিশ্চয়। কোইবার ওনেক মেহমানলোগ বড়াবাবুকে বলেছে। লেকিন উনি বিসওয়াস করেননি।

—তোমরা কোনওদিন কিছু দেখেছ?

—হামি দেখেনি। গাঁওবালি ভাই-বেরাদর যারা আসে, দেখেছে। উরা তো পিছনসাইডের ঘরে শোয়। পিসাব কোরতে রাতে উঠেছিল, তোখোন।

—কী দেখেছে?

—দুটা সফেদ কাপড়া-পরা ঢেঙ্গা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদের পিসাব বন্ধ্ হয়ে গেছিল ডাবলুবাবু। বুখার এসে গেল। আপলোগ এক কাম করুন, তিনতলায় চলে যান। চাবি হামাদের কাছে আছে।

চারিদিকে এত রোদ্দুর, তবুও আমার গায়ে কাঁটা দিল। বাবলু দোতলায় পালিয়ে গেছে।

উপরে এসে দেখি, বাবলু কাপড়চোপড় ব্যাগে ভরছে। ওর চোখমুখের চেহারা অন্যরকম।

—কীরে! কী করছিস?

—দেখতেই পাচ্ছিস। আর একমুহূর্ত এখানে থাকা নেই। আইব্বাপ! ভাবতে আমার শরীর শিউরে উঠছে। একখানা আস্ত ভূতবাড়ি।

—বাঃ-বাঃ! প্রাণের বন্ধুকে ফেলে পালাচ্ছিস?

—ফেলে পালাব কেন? তোকে নিয়েই যাব।

—আমি যেতে পারব না বাবলু। মামা দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে গেছেন, চলে যাব কী করে? তোর কি, তোর তো আর মামা নয়! আমায় থাকতেই হবে। সব বুঝে তবে যাব।

—কী বুঝবি? বোঝার বাকি আছে কিছু? ওদের কাছে শুনলি সব। তারপরেও? ডবলু, ফালতু গোয়ার্তুমি করসি না। চল, বেরিয়ে পড়ি।

—কোথাও যাচ্ছি না। এখানে, এই ঘরেই থাকব। আর শুনে রাখ, তোকেও থাকতে হবে। বাবলু, তোর একটুও লজ্জা করছে না? এটা একুশ শতক, বিজ্ঞানের যুগ। আমরা বিজ্ঞান পড়ছি। যুক্তি-বুদ্ধি সব জলে ফেলে দেব? এত ঘিঞ্জি এলাকা, এত মানুষ। 'ভূত' থাকে কখনও? ভূত বিশ্বাস করব?...সব নামিয়ে রাখ্। আজকেই একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

এখন রাত এগারোটা। আমাদের দোতলার গেস্টরুমে মাটিতে পরপর তিনটে বিছানা। ছবিলাল, বিন্দেশ্বর আর উপেন আজ এখানেই শোবে। খাটে আমরা।

ওই তিনজনকে রাজি করাতে আমার কালঘাম ছুটে গেছে। বিশেষ

করে দুই মুশকো বিহারি দারোয়ানকে। শেষে কথা দিতে হয়েছে, আমরা 'তেনাদের' বিরক্ত করব না।

দোতলার সবকটা ঘরেরই তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ঢোকার জন্যে। সন্ধে-সন্ধে ভেতরে ঢুকে দেখেও এসেছি। র‍্যাক, আলমারি, টেবিল ভরতি। পুরোনো বইয়ের স্তূপ। ধুলো, নোংরা মেঝেয়।

সারাদিন বিশেষ লেখাপড়া কিছু হয়নি। মন বসাতেই পারছিলাম না। আমার অবস্থা হয়েছে 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়'...। চারজন উলটোদিকে, আমি একদিকে।

সাড়ে এগারোটার মধ্যে গেট বন্ধ। সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। চারিদিকে এখন অন্ধকার। বাবলু মাঝের পাশবালিশ সরিয়ে আমার গা ঘেঁষে শুয়েছে।

ছবিলাল আর বিন্দেশ্বর মিনিট পাঁচেক সুর করে রামনাম আওড়াল। দুজনের অবস্থাই বেশ সঙ্গীন। তারপর একটু বিরতি। এখন সুর করে নাক ডাকছে।

শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করছি। পাশে পাথরের মতো বাবলু। মুখ গুঁজে পড়ে আছে। আলো জ্বালতে পারলে একটু বই-টই পড়া যেত। তার উপায় নেই।

নাসিকাগর্জন আস্তে-আস্তে সয়ে এল।...

হঠাৎ—হঠাৎ!

অ্যাই! ওই যে। আবার! আবার।—বাবলুর কম্পমান ফিসফিস এবং প্রবল ঠেলা,—শুনছিস?

প্রবল জোরে কেউ কড়া নাড়ছে। খট্-খট্-খটা-খট্...!

মিনিটখানেকের মধ্যে করিডরে 'ছপ্-ছপ্'। জেগে উঠেছে পায়ের শব্দ।

বাবলু আমার বাহু আঁকড়ে আছে। ওর কাঁপুনি টের পাচ্ছি। লাফ দিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছি, বাবলু আমায় চেপে ধরল।

—কী হল, ছাড়!

—তুই যাবি না।

—আরে ভাই, দেখতে হবে তো! না-হয় তুই চল্ আমার সঙ্গে।

বন্ধুর জন্যে বেচারি বাবলুর কী অবস্থা! প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু যেতে হচ্ছে।

আস্তে-আস্তে গুঁড়ি মেরে খাট থেকে নামলাম। ঘুমন্ত তিন কুম্ভকর্ণকে পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে। দরজা খুলেছি।

নাহ্! পায়ের আওয়াজ করিডরে নয়। কোনও ঘর থেকে আসছে। মনে হচ্ছে, পাশের ঘর। কড়া নাড়ার শব্দও সেখান থেকে আসছে। খট্-খটাখট্! সমানে কেউ কড়া নাড়ছে। বাইরে আসতে চাইছে। কেন? ওই ঘরে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

বুকের মধ্যে দমাদ্দম হাতুড়ি পিটছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সপসপে। এখন কী করব?

আমাদের নড়াচড়ায় এবং কড়া নাড়ার আওয়াজে ঘরের তিন বীরপুরুষ যে জেগে গেছেন, হঠাৎ টের পেলাম। তিনটে অস্ফুট আর্তনাদ!

'বাপোলো! মরি গিলা।'...'মর গয়া!'...'আয়বাপ্! রামরাম।'...ওড়িয়া এবং হিন্দি।

পরক্ষণে তিনটে দশাসই জোয়ান আমাদের পাশ কাটিয়ে দুদ্দাড় করে নিচে নেমে গেল। কিছু বলার সুযোগ পেলাম না।

সামনে দুটো পথ! ওদের মতো নীচে নেমে যাওয়া। অথবা, যা আসুক, সোজাসুজি তার মুখোমুখি হওয়া। ঠিক আছে, দ্বিতীয়টাই হোক। যা থাকে কপালে!

পা টিপে-টিপে এগোচ্ছি পাশের ঘরের দিকে। বাবলু আমার সঙ্গে।

ঘরের দরজায় কান পাতলাম। হ্যাঁ, উলটোদিকে কেউ সজোরে কড়া নেড়ে যাচ্ছে। তারাই হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরের মেঝেয়।

নিজের সাহস ছাপিয়ে যাচ্ছি! হাত-পা কাঁপছে। একধাক্কায় খুলে গেল দরজা। ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। যন্ত্রচালিতের মতো হাত চলে গেল সুইচবোর্ডে। সবক'টা সুইচ টিপে দিয়েছি।

সেকেন্ডের মধ্যে ঘর ভেসে যাচ্ছে ধবধবে আলোয়।

আমার চক্ষুস্থির!

মোটাসোটা একদল ধেড়ে ইঁদুর! মুহূর্তে ছুটে লুকিয়ে যাচ্ছে দেওয়ালের দিকে!

ওরেব্বাস! এরাই নৃত্য করছিল এতক্ষণ। এরাই মামাবাড়ির ভূত!

বাবলু ছুটে গেল প্রচণ্ড আক্রোশে। একটা লাঠি তুলে প্রবল আক্রোশে দমাদ্দম পেটাচ্ছে।

আমি গলা তুলে ডাক ছেড়েছি ওই তিনজনের উদ্দেশে,—ছবিলাল! বিন্দে! উপেন!

ততক্ষণে বাবলু আবিষ্কার করে ফেলেছে আরও এক রহস্য। গোপন সুড়ঙ্গ। জানলার কাঠ ফুটো করে ওরাই বানিয়েছে। রাত গভীর হলে বাড়ির পাইপ বেয়ে উঠে আসে। ঢুকে পড়ে ওই সুড়ঙ্গপথে। তারপরে, হ্যাঁ তারপরে শুরু হয় রাতের নৃত্য! ওদের খেলাধুলো।

সর্বশেষ খবর ঃ একটি ইঁদুর-ভূত শেষপর্যন্ত নিহত হয় বাবলুর যষ্ঠি আঘাতে। বাকিরা নিরাপদে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল।

নির্লজ্জ দরোয়ানগুলো খ্যা-খ্যা করে হাসছিল।
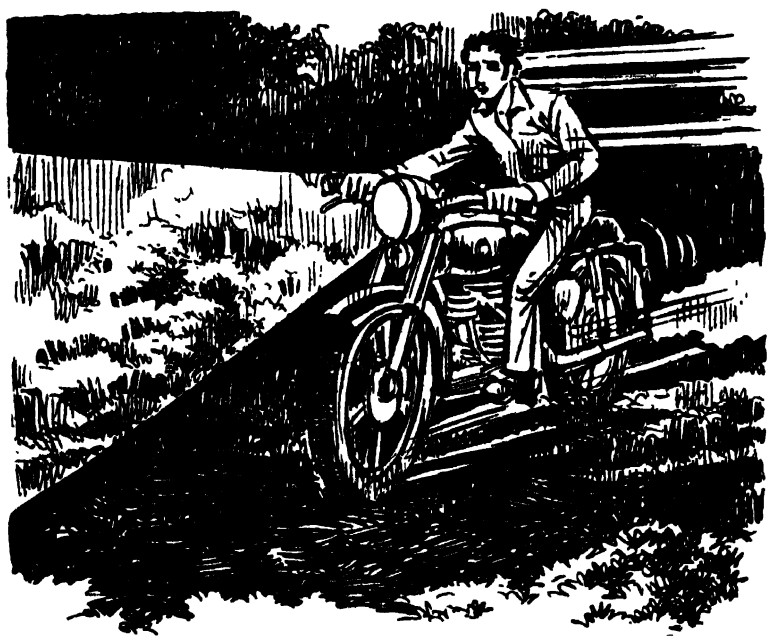
মুখোমুখি

বলহরি গাছের মগডালে বসে একমনে ঠ্যাঙ দোলাচ্ছিল। প্রায় তিনদিন তিনরাত একভাবে বসে আছে। একটাও কাজ নেই। ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল।

আশেপাশের গাছে-ডালে সারি-সারি আরও অনেকে বসে আছে। কেউ-কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ-কেউ নিজেদের মধ্যে সুখদুঃখের গপ্পোগাছা করছে। দু-একজন ওর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে চেয়েছিল। বলহরি সাড়াশব্দ না করায় চুপ করে গেছে।

যাকে বলে উদ্বাস্তুর মতন অবস্থা! বনবাদাড়-গাছপালা কেটে ফাঁক করে দিচ্ছে, বাড়ি-কলকারখানা-খেতজমি করছে। ওরা ঠাঁই নাড়া। এখান থেকে ওখানে খ্যাদানি খেতে-খেতে হপ্তাখানেক হল,

এই জায়গায় এসে একটু খিতু হয়েছে। তবে কদ্দিন থাকতে পারবে, জানে না।

কবে যে ওপারে যাওয়ার টিকিট মিলবে, কোনও নিশ্চয়তা নেই। এত ভিড়! 'নো-এন্ট্রি' বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। বুকিং কাউন্টারে গিয়ে কম কাকুতি-মিনতি করেছে বলহরি! লোকটার কোনও দয়ামায়া নেই। পাষণ্ড! পষ্ট বলে দিয়েছে, 'বে-লাইনে কিছু হবে না। অ্যাপ্লিকেশনের তারিখ অনুযায়ী পরপর সিট আসবে।'

সব নাকি আগে থেকেই ঠিক থাকে, কে কবে আসবে! যদি টাইমই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সিট দিবি না কেন? কে জবাব দেবে—ধ্যুর!

দুর্নীতি! দুর্নীতিতে পৃথিবীটা ভরে গেছে। সব ব্যাটা নচ্ছার। ধান্দাবাজ।

নিজেদের মধ্যেও কোনও একতা নেই। বলহরি কিছুদিন আগে একবার উদ্যোগ নিয়েছিল। গিয়ে-গিয়ে সবাইকে বলেছিল, 'চলো, সবাই মিলে। আমরা আন্দোলন করব। আমাদের টিকিট দিতে হবে। নইলে গদি ছাড়তে হবে। দেখবে, সুড়সুড় করে রাজি হয়ে যাবে। একতার থেকে বড় কিছু নেই।'

ওর জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়েছিল। দলবল নিয়ে ও সবার আগে বুক চিতিয়ে হাজির হল বুকিং কাউন্টারে। পাষণ্ডটা ওকে জুলজুল চোখে দেখছিল।

সবে বলতে শুরু করবে, কী খেয়াল হতে পিছনে তাকিয়ে হতভম্ব। এ কী! সব ভোঁ-ভাঁ। পিছনে কেউ নেই, ও একা!

সে যে কী লজ্জা, এখনও ভাবলে রি-রি করে ওঠে রাগে। হতচ্ছাড়াগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। বলহরি ফুঁসতে-ফুঁসতে তাদের কাছে ছুটে গেছিল।

'কী ব্যাপার?'

'না রে ভাই।' দলের একজন মিনমিন করে বলল, 'ঝুটঝামেলায় আর যাব না। শেষে ব্ল্যাক-লিস্ট করে দেবে। টিকিট আর পাবই না। এখানে থেকে পচতে হবে।'

যত্তসব ভিতু-ডরপোক! এদের দিয়ে কিস্যু হবে না। আজ এইজন্যেই ওদের এই অবস্থা। রাগের চোটে তার পর থেকে বলহরি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। ঝিম মেরে বসে আছে।

এই গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে টানা পথ চলে গেছে গোবর্ধনপুরের দিকে। প্রথমে শ্মশান, তারপর লোকালয়।

রাস্তাটা ফাঁকা-ফাঁকা থাকে প্রায় সময়েই। মাঝে-সাঝে দু-একটা শেয়াল, কুকুর ল্যাজ খাড়া করে ছুটে যায়। ক্বচিৎ-কদাচিৎ জনমনিষ্যি দল বেধে শব্দ করতে-করতে চলাচল করে।

এ একরকম ভালো। দিনকাল যা পড়েছে, এখন তো 'হুজ্জুতি' করার কথা ভাবা যায় না। সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে, ঝাপড়ডাঙার জঙ্গল এখনও শান্তির জায়গা।

তবু হঠাৎ-হঠাৎ যাচ্ছেতাই ঘটনা ঘটে যায়। যেমন পরশু রাতে। বলহরি বাপের জন্মে অমন ঘাবড়ে যায়নি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন নিষ্কর্মা বসে থাকতে-থাকতে একটু-আধটু ঝিমুনি এসে যায়। স্বাভাবিক। পরশুও তাই হয়েছিল। হেলান দিয়ে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, বলহরির খেয়াল নেই।

আচমকা ঠিক কানের গোড়ায় বিকট চিৎকার—

'ব্যালা...হরি...!'

আরটু হলেই হুড়মুড় করে পড়ে যেত গাছ থেকে। কোনওক্রমে শেষমুহূর্তে ডাল ধরে ফেলেছিল, তাই রক্ষে।

অ্যাঁ! ওকে ডাকছে! কেন?

তারপর চোখ-টোখ কচলে দেখল, সাত-আটটা চ্যাংড়া ছোঁড়া। চারজনের কাঁধে একটা ফুল-সাজানো খাট, খাটে এক বুড়োর বডি। অন্যগুলোর হাতে হ্যারিকেন, ধুনুচি, মশাল। ফুর্তি করতে-করতে শ্মশানে যাচ্ছে ছোঁড়াগুলো। সিটি মারছে, নেত্য করছে। ওই আওয়াজটা 'হরিধ্বনি'! ছিঃ ছিঃ, কোনও ফিলিংস নেই। এরা সব মানুষ?

বলহরি লক্ষ করল, ওর আশেপাশের সঙ্গীসাথীরা সুটসাট করে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। ও কী করবে, বুঝে ওঠার আগেই, শববাহকদের দলের একটা ছোঁড়া নিচুগলায় বলল, 'অ্যাই, আস্তে!

জায়গাটা সুবিধের নয়।'

বাকি ক'টা অমনি রে-রে করে উঠল. 'কেন র‍্যা? কী হয়েচে?'

'আহা, কিছু হয়নি। শুনেচি, এই জঙ্গালে নাকি 'ইয়েরা' মানে...'

'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...'

শুনেই এমন খ্যাক-খ্যাক করে হায়েনার মতো সবকটা হেসে উঠল, বলহরির পিলে চমকে উঠেছে। ওদের মাতব্বরটা দাঁত বার করে হাসতে-হাসতে প্রথমজনের পিঠ চাপড়ে দিল।

বলল, 'তাই নাকি? হ্যাঃ-হ্যাঃ—ব্যাটা ভিতু কাঁহিকা। চল, দেখি কোথায় কে আছে। আজ পেলেই ধরব—হ্যাঃ-হ্যাঃ...।'

আইব্বাপ! নচ্ছারগুলো যে খাট নামিয়ে রেখেছে! এগুলো কি ডাকাত ভয়ডর নেই!

হঠাৎ ওদের একজন বলল, 'দ্যাখ-দ্যাখ, একটা ছায়া! ওটা নাকি?'

'কই? কই?' বলতে-বলতে সবকটা ছুটে এল গাছের নীচে।

বলহরির তখন যায়-যায় অবস্থা! মশাল-হ্যারিকেন ওরা উঁচিয়ে ধরেছে, আগুনের আঁচে ঝলসে যাচ্ছে গাছের পাতা।

'বাপরে-মারে' করতে-করতে বলহরি লাফিয়ে পালাতে গেল। অন্ধকারে বুঝতে না পেরে গিয়ে পড়ল ঘাপটি মেরে বসে থাকা এক সঙ্গীর ঘাড়ে। ককাতে-ককাতে সেই সঙ্গী ওর চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করল।

করুক গে! একচুলের জন্যে রেহাই পেয়ে গেছে বলহরি। নইলে ওই হারামজাদাগুলো কী যে করত!

চ্যাংড়াগুলো তারপরেও অনেকক্ষণ নীচে বসে ছিল। উদ্দণ্ড নেত্য করেছে, খাট বাজিয়ে হেঁড়ে গলায় গান গেয়েছে, হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়েছে।

বলহরি নিঃশব্দে উপরে বসে থেকেছে, কতক্ষণে আপদ বিদেয় হয়!

সত্যি, কী দিনকাল পড়ল! ভাবলে বলহরির বুকটা হু-হু করে ওঠে। এ পৃথিবী আর বাসযোগ্য রইল না।

কোথায় ভেবেছিল, টিকিট যখন পাচ্ছে না, যদ্দিন থাকবে মৌজ করে থাকবে। যারা-যারা ওকে হেনস্থা করেছে, সব সুদে-আসলে উসুল করে নেবে। ধ্যুৎ, ধ্যুৎ! সব পুরো পালটে গেছে। এভাবে টিকে থাকার কোনও মানে হয়?

বহু-বহুদূর থেকে অস্পষ্ট একটা গুর-গুর শব্দ। বলহরি কান খাড়া করল। কীসের শব্দ?

মগডালে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ সরু করল। একটা বিন্দু একটু-একটু করে বড় হচ্ছে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, একটা মোটরসাইকেল। লোকটা কে? এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

নলহাটি থেকে গোবর্ধনপুর অনেকটা পথ। প্রায় একশো মাইল। তবে বীরেশ্বরের কাছে এ দূরত্ব নস্যি। ওর দু-চাকার পক্ষীরাজ যতক্ষণ ফিট, বীরেশ্বর থোড়াই পরোয়া করে। আর এই বাইক হচ্ছে টু-ইন-ওয়ান। ওর প্রোগ্রামের বিশেষ আকর্ষণ।

কাল রাতে শো ছিল নলহাটিতে। দারুণ জমে ছিল। মেলার মাঠ গিজগিজ করছিল কালো মাথায়। উদ্যোক্তারা খুব খুশি। চুক্তি যা হয়েছিল, তার চেয়েও হাজার টাকা বেশি দিয়েছে।

শুতে-শুতে অনেক রাত। তারপর সকালে লুচি-তরকারি-মিষ্টি দিয়ে জলযোগ সারার সময় পঞ্চায়েত-প্রধান বিশু মণ্ডল যখন খুব করে অনুরোধ করল দুপুরে চাট্টি মাংস-ভাত খেয়ে যেতে, বীরেশ্বর ফেলতে পারল না। খেতে ও বড্ড ভালোবাসে।

দলবল অবশ্য সরঞ্জাম নিয়ে ম্যাটাডোরে বেলাবেলি রওনা হয়ে গেছে। আজ সন্ধে সাতটায় গোবর্ধনপুরে আবার শো। জাদুসম্রাট বীরেশ্বরের ইন্দ্রজাল!

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। গোলমালটা হল, খাওয়ার পরে একটু

গড়িয়ে নিতে গিয়ে। বিশুবাবু ঠেলেঠুলে চারটেয় তুলে না দিলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। তবুও এতখানি পথ সাতটায় পৌঁছনো অসম্ভব।

বীরেশ্বর তখন হড়বড়িয়ে বাইকে স্টার্ট দিচ্ছে। এইসময় একজন অল্পবয়সি ছেলে বলল, 'স্যার, একটা শর্ট কাট রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা। তবে—'

ছেলেটা একটু ঢোক গিলল।

'তবে কী? আরে, বলে ফেলুন মশাই, ওই পথ দিয়েই যাব! এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। তেলও বাঁচবে।'

'আঃ রোহিনী! কী আবোলতাবোল বকতেছ। থামো দিকিনি।' বিশু মণ্ডল দাবড়ে উঠল, 'না-না ম্যাজিশিয়ান সায়েব, ও রাস্তায় গিয়ে কাজ নেই। আপনি হাই রোড ধরুন।'

বীরেশ্বর অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষ। রহস্যের গন্ধ পেল। বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে বলল, 'প্রধান সায়েব, ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো? চোর-ডাকাতের ভয়? আমার কী করবে? টাকাকড়ি সঙ্গে বিশেষ নেই।'

'না-না, ঠিক চোর-ডাকাত নয়। লোকে বলে, মাঝে যে ঝাপড়ডাঙার জঙ্গল পড়ে, সেখানে ইয়ে মানে নানারকম উৎপাত... কয়েকজন নাকি ভয়-টয় পেয়ে—'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ...।' বিশুবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই বীরেশ্বর হেসে উঠল। বলল, 'প্রধানসায়েব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার ওসবে একফোঁটা বিশ্বাস নেই। ভয় তো দূরের কথা। প্লিজ, আমায় শর্টকাট পথটা বাতলে দিন। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

সেই পথ ধরেই সাঁ-সাঁ করে ছুটছে বীরেশ্বরের পক্ষীরাজ। মাঝেমধ্যে এক-আধটু ভাঙাচোরা থাকলেও মোটের ওপর রাস্তাটা ভালো। গাড়িঘোড়া প্রায় নেই বললেই হয়। কম।

ঘণ্টাখানেক একটানা চলার পর একটা মোড়। বীরেশ্বর মোটরবাইক আস্তে করল। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ওদের কথা মিলে যাচ্ছে।

এবার তা হলে বাঁ-দিকে ঘুরতে হচ্ছে। বীরেশ্বর গাড়ি ঘুরিয়ে আবার স্পিড তুলে দিল।

সূর্য পশ্চিমদিগন্তের একটু ওপরে। দুদিকে ছড়ানো ধানক্ষেত, গ্রাম। রাস্তা দিয়ে দু-একজন লোক চলাচল করছে। ওদিক থেকে একটাও গাড়ি-সাইকেল কিছুই আসছে না।

পথ আরও নিরিবিলি হয়ে এল। সূর্য অর্ধেক ডুবে গেছে। কমলা আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। বীরেশ্বর একা, আর ওর পক্ষীরাজের গর্জন।

দূ-রে অনেকখানি দিগন্ত-আকাশ জুড়ে ঝাপসা পাহাড়ের মতো। পথ তার মধ্যেই মিশে গেছে। ও, ওটাই তা হলে ঝাপড়াডাঙার জঙ্গল।

দেখতে-দেখতে জঙ্গালের মুখে এসে পড়ল। গাছপালার ঠাসবুনোটে ভিতরের পথটা সুড়ঙ্গের মতো। একফোঁটা আলো নেই। বীরেশ্বর বাইকের হেড লাইট জ্বেলে দিল।

জঙ্গলটা কেমন থমথমে। অন্য জন্তুজানোয়ার নাহোক, একটা শেয়ালের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এত গাছ, পাখ-পাখালি নেই নাকি?

সামনে হলুদ আলোর বৃত্ত কাঁপছে, দুপাশে মিশমিশে অন্ধকার। নিঃশব্দ, নিঝুম। বীরেশ্বরের শরীর একটু ছমছম করে উঠল। এই জঙ্গালের কথাই বিশুবাবু বলেছিল। বোগাস্! যত্তসব বাজে কথা।

আরে! বীরেশ্বরের শরীর বেয়ে কাঁপুনি নেমে গেল, ওটা কে? হেডলাইটের ফোকাসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শুয়ে আছে রাস্তার ওপর। দু-হাত দু-দিকে ছড়ানো। কোনও মানুষ?

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যে কাছাকাছি চলে এল বাইক। এখন স্পষ্ট। একটা মাঝবয়েসি লোক। লাল ধুতি-ফতুয়া পরনে, চোখে চশমা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গাড়ি চাপা পড়েছে নাকি? কোনও রক্ত-টক্ত তো নেই! এমন বিচ্ছিরিভাবে রাস্তা জুড়ে রয়েছে, পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না।

একটু দূরে বাইক দাঁড় করিয়েছে বীরেশ্বর। মহা মুশকিল হল তো! কী করা যায়? বেঁচে আছে, না টেঁসে গেছে?

'ও মশাই, শুনছেন? ও মশাই, এই যে—!...'

গলা ফাটিয়ে বেশ কয়েকবার হাঁক দিল বীরেশ্বর। নাহ্, কোনও সাড়া নেই।

একপা-একপা করে এগিয়ে গেল বীরেশ্বর। টেনে তুলে ওকে সরাতে হবে।

কাছাকাছি এসে যেই না ঝুঁকে পড়েছে, লোকটা অমনি তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ছিটকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল বীরেশ্বর।

লোকটা তেড়িয়া গলায় বলল, 'বলি, ব্যাপারটা কী? গায়ে হাত দিচ্ছিলে কেন?'

বীরেশ্বর কুলকুল করে ঘামছে। মিনমিন করে বলল, 'কী করব? আপনি সাড়া দিচ্ছিলেন না যে।'

'দিইনি, বেশ করেছি। তোমার কী?'

'আহা, রাস্তা-জুড়ে শুয়ে ছিলেন, তাই—'

'বেশ করেছি, শুয়ে আছি। তোমার বাপের রাস্তা, অ্যাঁ!'

'আ-আপনি চটছেন কেন? আমায় যেতে হবে, মানে—'

'জানি, জানি। ম্যাজিক দেখাবে গোবর্ধনপুরে, লোককে বোকা বানাবে।'

কী কাণ্ড! লোকটা তাকে চেনে! বিগলিত বীরেশ্বর বলল. 'আজ্ঞে, হেঁ-হেঁ! আপনি আমায় চেনেন দেখছি।'

'চিনি মানে? বিলক্ষণ চিনি। তুমি হলে গে জাদুসম্রাট বীরেশ্বর, তোমায় চিনব না? কিন্তু তুমি যে আমায় চিনতে পারলে নাহে।'

আস্তে-আস্তে সাহস ফিরে পাচ্ছে বীরেশ্বর। পরিচিত লোক। তবে একটু খটকা লাগছে। এই নির্জন জঙ্গালের রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়েছিল কেন?

'না-মানে—একটু চেনা-চেনা লাগছে...'

'হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ।' লোকটা অকারণে খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল। বলল, 'ঠিকই তো। কত লোক দেখছ, কতজনকে টুপি পরাচ্ছ, কতজনের কাপড় খুলছ, সবাইকে কি মনে থাকে? আমি অবিশ্যি তোমায় সারাজীবনে ভুলিনি। তুমি যা করেছ—'

'হেঁ-হেঁ—যদি একটু পরিচয় দেন।'

'দেব, দেব। অত তাড়া কীসের?'

'না-মানে—আপনি তো জানেন আমার শো আছে।'

'তা থাকুক না। সব জায়গায় কি সবসময় পৌঁছোনো যায়! আচ্ছা জাদুকর, তোমার বলহরিকে মনে আছে? বল্লভপুরের সাধু বলহরি।'

বলহরি? বল্লভপুর? হ্যাঁ, সত্যিই চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

'মনে পড়ছে না তো? জানতাম। সে কি আজকের ব্যাপার! নয়-নয় করেও সাত-আট বচ্ছর পেরিয়ে গেছে।' লোকটা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বলল, 'তা হলে আমিই বলি। কেমন?'

'বল্লভপুরের বুড়ো শিবতলায় সাধু বলহরির আখড়া। লোকে বলে, সাধুর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা। দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখতে পায়। ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেয়। শূন্য থেকে প্রসাদী ফুল ধরে এনে ভক্তদের দেয়, মন্ত্র পড়ে তাবিজ-কবচ দেয়। ভালোই চলছিল বলহরির। ভিড় খুব। দূর-দূর গাঁ-গঞ্জ থেকে মানুষজন, রোগীরা আসে সাধুবাবার কাছে 'প্রসাদ' নিতে।

এই সময় তুমি এলে। তখন বিকেল। আমার আখড়ায় খুব ভিড়। অনেক লোকজন, প্রায় মেলা বসে গেছে। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলে। তোমার সঙ্গে কয়েকজন ছেলেছোকরা ছিল।...'

মনে পড়ে গেছে বীরেশ্বরের, মনে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই মাল। পাশের গ্রাম মল্লারপুরে রাতে ওর শো ছিল। সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে চলে এসেছিল বল্লভপুরে। ওমা, এসে দেখে পুরো ভণ্ড! দিনের-পর-দিন পাতি হাতসাফাইয়ের খেল দেখিয়ে সরল সাদাসিদে লোকগুলোকে বোকা বানাচ্ছিল। ওর আর সহ্য হয়নি। সোজা ভিড় ঠেলে এসে চ্যালেঞ্জ করেছিল। 'হাঁ' হয়ে যাওয়া ভক্তদের সামনে সাধুর ম্যাজিকগুলো দেখাতে শুরু করেছিল।...

বীরেশ্বর শুনল, লোকটা বলে যাচ্ছে,

'আমি কি তোমার কোনও ক্ষতি করেছিলাম জাদুকর? তুমি সবার সামনে আমায় উলঙ্গ করে দিলে। তবু আমি বললাম, তুমি আমার চেয়ে বড় তান্ত্রিক, আমি প্রণাম করছি। তুমি কোনও কথা শুনলে না। আমার সব গুহ্যক্ষমতা ফাঁস করে দিলে। বললে, এসব হাতের কারসাজি, কোনও ক্ষমতা-টমতা নেই।

আমার সর্বনাশ করে তুমি হাসতে-হাসতে চলে গেলে। তারপর কী হয়েছিল জান? বেধড়ক পিটুনি দিয়ে, মাথা কামিয়ে লোকজন আমায় গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল। সেই রাতেই। আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না।

সেই রাতেই আমি গলায় দড়ি দিয়েছিলাম। আর তার পর থেকে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার এতবড় ভালোবাসার প্রতিদান দিতে হবে না? বলো?'

বীরেশ্বরের কথা বলার ক্ষমতা নেই! সারা শরীরে হিমস্রোত ওঠানামা করছে। হাত-পায়ে খিঁচুনি দিচ্ছে।

ওর কাছে গোটা ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার।

এ বলহরি নয়, বলহরির চন্দ্রবিন্দু! ওকে ধরার জন্য ইচ্ছে করেই পড়ে ছিল রাস্তা জুড়ে।

'কী হে জাদুসম্রাট, চুপ করে আছ কেন? দেখাও, ম্যাজিক দেখাও!'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ওপর কোত্থেকে একপাল বাদুড় চক্কর কাটতে শুরু করল। কী তীক্ষ্ণ শিস্ আর ডানার ঝটপটানি।

তবে কি ভয় পেয়েই বীরেশ্বরকে বেঘোরে মরতে হবে? স্রেফ ভয়! আর কিছু করার ক্ষমতা তো বলহরির নেই। গলা টিপে ধরবে? নাঃ, তাও পারবে না, ওর কায়া নেই, শুধু ছায়া। পা দুটো ঠকঠক করে কেঁপে যাচ্ছে, বীরেশ্বর নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে।

'কী হে কত্তা! ম্যাজিক দেখাবে না তা'লে। আমার জাদু দেখবে?'

বলতে-বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল বলহরি। খ্যাক-খ্যাক হাসির শব্দ। বীরেশ্বর ঘাড় উঁচিয়ে দেখে, শূন্যে ভাসছে। পরক্ষণেই বলহরি

লম্বা হতে থাকল। দেখতে-দেখতে ঢ্যাঙা তালগাছ। চোখদুটো এখন গোলগোল, রাগে ফুঁসছে।

'খুব তো ম্যাজিক দেখাও! পারবে এরকম? এইবার যদি তোমার ঘেঁটি ধরে তুলে আনি ওপরে, কেমন লাগবে?'

'হাঃ...হাঃ...হাঃ...হাঃ...!'

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বীরেশ্বর। সে হাসি জঙ্গালের গাছে-গাছে ধাক্কা খেয়ে বাজতে লাগল। বাদুড়ের ঝাঁক নিমেষে হাওয়া।

কিছুটা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বলহরি। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে মাপছে। ব্যাপারখানা কী! ট্যাঁটা লোকটা ভয় না খেয়ে উলটে বিকট হাসছে। ওকে ভয় দেখাতে চাইছে নাকি? মতলব সুবিধের বোধ হচ্ছে না।

'কী হে, হাসছ যে বড়! হাসির কথা বললাম নাকি?'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাসির কথাই তো! তুমি তো আর মানুষ নেই হে সাধুবাবা। তোমার তো শরীর নেই, আমায় ধরবে কী করে? আমিও কি ধরতে পারব তোমায়! কিছুই নেই তো তোমার, স্রেফ একখানা ছায়া হয়ে টিকে আছ।'

বলহরি চুপ।

'শোনো হে বলহরি, তোমার দেহ নেই, তাই যখন খুশি অদৃশ্য হতেই পারো। পারবে আমার মতন আস্ত একখানা শরীর নিয়ে অদৃশ্য হতে? এই দ্যাখো!'

বলহরি হতভম্ব হয়ে দেখল, জাদুকর হাওয়া! কোথাও নেই। কয়েকসেকেন্ডের মধ্যে আবার একই জায়গায়! ওর মোটরবাইকের পাশে।

অ্যাঁ! এ তো সাংঘাতিক মানুষ। ও চন্দ্রবিন্দু হয়েও ওকে দেখতে পেল না। না, বেশিক্ষণ দাঁড়ানো বোধহয় ঠিক হবে না!

বলহরি চটপট ফের গাছের মগডালে লুকিয়ে পড়ল। সেখান থেকেই বলল, 'যাক্‌গে, যাও, যাও। কথা বাড়িও না।'

এবার বীরেশ্বরের পালা। মোটরবাইকে বসে সে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কই গেলে গো বলহরি! তোমার মূর্তিখানি দেখাও।

তারপর দেখবে কী করি! হ্যাঁ, এই বলে যাচ্ছি। বেশি ভ্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে আস্ত জঞ্জালটাই এরপর ভ্যানিশ করে দেব। তখন ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে। মনে থাকে যেন।'

বীশ্বেরের বুকের মধ্যে অবিশ্যি এখনও ধক-ধক করছে! জামাপ্যান্ট ভিজে গেছে ঘামে। প্রাণের দায়ে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল। সম্মোহন বিদ্যা সে শিখেছিল তার গুরুর কাছে। সেটা যে কায়াহীনের ওপরে এমন অব্যর্থ কাজ করবে, নিজেও ভাবতে পারেনি।

ইঞ্জিনে ঝড় তুলে বীরেশ্বরের মোটরবাইক এগিয়ে চলল গোবর্ধনপুরের দিকে।